ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা ১৯৪৮-১৯৬৯

ইউনিট ১৩

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৩.১ ঃ ভাষা আন্দোলন : পটভূমি, ঘটনা প্রবাহ ও প্রভাব
পাঠ-১৩.২ ঃ যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচন
পাঠ-১৩.৩ ঃ সামরিক শাসন ও আইয়ুবীয় স্বৈরাচার
পাঠ-১৩.৪ ঃ ছয় দফা আন্দোলন
পাঠ-১৩.৫ ঃ আগরতলা মামলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
পাঠ-১৩.৬ ঃ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

পাঠ-১৩.১ ভাষা আন্দোলন : পটভূমি, ঘটনা প্রবাহ ও প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট জন্মের সময় পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভাষা আন্দোলনের পটভূমি বলতে পারবেন;
- ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিবরণ দিতে পারবেন;
- একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলির বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ভাষা আন্দোলনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পাকিস্তানের জন্ম, প্রদেশের সংখ্যা, পাকিস্তান গণপরিষদ, পাকিস্তানে প্রথম গভর্নর জেনারেল ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী, তমাদ্দুন মজলিশ, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, ১১ মার্চ, ২১ ফেব্রুয়ারি, শহীদ দিবস।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও স্বাধীন পাকিস্তানের জন্ম

১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' পাস হয়। এই আইন বলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান ছিল এক অস্বাভাবিক রাষ্ট্র। বিশাল ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রান্তে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার ব্যবধানে দুই ভিন্ন ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। স্বাধীনতা লাভের সময় পাকিস্তানকে ৫টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল।

পাকিস্তানের পূর্বাংশে ছিল পূর্ববাংলা নামক ১টি প্রদেশ এবং পশ্চিমাংশে ছিল ৪টি প্রদেশ। যথা পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। ১৯৫৫ সালে পূর্ববাংলা প্রদেশের নাম পরিবর্তন করে করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। ঐ সালে পশ্চিমাংশের সবগুলো প্রদেশ এক ইউনিটে এনে একটি প্রদেশ করা হয় এবং তার নামকরণ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তানের মোট ভূখণ্ডের শতকরা ৮৪.৩ ভাগ আয়তন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের এবং মাত্র ১৫.৭ ভাগ আয়তন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। জনসংখ্যার শতকরা ৪৩.৭ ভাগ লোকের বাস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ৫৬.৩ ভাগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে।

লোকসংখ্যা
৪৩.৭ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান
৫৬.৩ ভাগ পূর্ব পাকিস্তান

ভূখণ্ড
৮৪.৩ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান
১৫.৭ ভাগ পূর্ব পাকিস্তান

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি লিয়াকত আলী খানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ব্রিটিশ আমলে বাংলা নামক যে প্রদেশ ছিল তা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা নামক দুটি অংশে বিভক্ত করে এবং পশ্চিম বাংলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত এবং পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের অংশ বলে ঘোষণা করে। তখন ঢাকায় পূর্ব বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়।

পূর্ববাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন খাজা নাজিমউদ্দিন এবং প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন স্যার ফ্রেডারিক বোর্ণ।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করলে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তখন নূরুল আমিনকে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। তিনি ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর শাসনামলে পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়।

ভারত ও পাকিস্তান (১৯৪৮-১৯৭১)

ভাষা আন্দোলন (১৯৪৭-৫২)

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ৯৭ ভাগ এবং পূর্ব বাংলায় শতকরা ৮০ ভাগ অধিবাসী ছিল মুসলমান। অধিকাংশ অধিবাসীর ধর্ম এক হলেও ভাষা ছিল ভিন্ন। তাই পাকিস্তান সৃষ্টির সময় রাষ্ট্রভাষা কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করলে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীমহল, ছাত্রসমাজ, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী প্রমুখ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পাল্টা প্রস্তাব করে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জ্ঞানগর্ভ যুক্তি দিয়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রতি সমর্থন জানান।১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত নবগঠিত রাজনৈতিক সংগঠন পূর্বপাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের কর্মী সম্মেলনে বাংলাভাষাকে পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করার দাবি জানানো হয়। একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন ভাষার প্রশ্নে সোচ্চার হয়। সংগঠনটির নাম ছিল 'তমাদ্দুন মজলিশ'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তারিখে উক্ত সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠন ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। পুস্তিকাটির নাম ছিল : 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা - বাংলা না উর্দু'। তমাদ্দুন মজলিশ ছাত্র-শিক্ষক মহলে বাংলাভাষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। ১৯৪৭ সালের মধ্যেই বহু প্রখ্যাত এবং অখ্যাত লেখক বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রতি তাদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বাঙালিদের দাবি উপেক্ষা করে উর্দুকে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়। যদিও পাকিস্তানের শতকরা মাত্র ৩.২৭ ভাগ লোকের মাতৃভাষা ছিল উর্দু তথাপি পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাকটিকেট, মানি অর্ডার ফরম, রেলের টিকেট প্রভৃতিতে কেবল ইংরেজি ও উর্দুভাষা ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তানের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিষয়তালিকা থেকে এবং নৌ ও অন্যান্য বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় বাংলাকে বাদ দেয়া হয়। এমনকি পাকিস্তানের গণপরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুকে নির্বাচন করা হয়। ফলে বাঙালিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন

পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮)। অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব দেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন যে, যেহেতু পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা বাংলা, সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কিন্তু তার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। গণপরিষদের অধিবেশনে লিয়াকত আলী খান মন্তব্য করেন যে, যেহেতু পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র তাই পাকিস্তানের সরকারি ভাষা মুসলমানের ভাষা হওয়া উচিত। লিয়াকত আলী খান আরও যুক্তি দেন যে, যেহেতু পাকিস্তানের মুসলমানদের সাধারণ ভাষা উর্দু, অতএব উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র সরকারি ভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়। গণপরিষদে অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবকে দেশের সংহতি ও অখন্ডতা বিনষ্ট করার প্রয়াস বলে মন্তব্য করেন। গণপরিষদ অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত আনীত প্রস্তাব ভোটে দেয়া হলে অগ্রাহ্য হয়। সে সময় পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালি মুসলমান সদস্যগণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি গণপরিষদে অগ্রাহ্য হওয়ায় পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। বাংলা ভাষার সংগ্রামকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে ২ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকার ফজলুল হক হলে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। পরিষদে নিম্নলিখিত সংগঠনের প্রত্যেকটি থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা: তমাদ্দুন মজলিশ, গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল সহ অন্যান্য ছাত্রাবাস, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ফেডারেশন।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১১ মার্চ (১৯৪৮) পূর্ব বাংলার সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট আহবান করে। কিন্তু পূর্ববাংলার সরকার বাংলাভাষার আন্দোলনকে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রচার করে। সরকারী পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের মিছিল ও সমাবেশে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল আলমসহ ৬৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বস্তুত, জেলের বাইরে এবং

ভেতরে থাকার সময় বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার ভূমিকা পালন করেছিলেন। ছাত্রদের আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়নি, বরং পরের দিনগুলিতে এই আন্দোলন আরো জোরদার হতে থাকে। সাধারণ জনসাধারণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। পরিস্থিতি খারাপ বুঝতে পেরে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে ১৫ মার্চ আলোচনায় বসেন এবং ৮ দফা চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন। চুক্তির মূল বিষয় ছিল ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে, পুলিশি অত্যাচার নির্যাতনের বিষয়ে তদন্ত করা হবে, পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে, সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে ইত্যাদি।

কিন্তু পূর্ববাংলা সরকার চুক্তির শর্তগুলি বাস্তবায়ন না করায় ভাষা আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এমনি পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯ মার্চ পূর্ব বাংলা সফরে আসেন। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে তিনি স্বৈরাচারী মনোভাব দেখান। ২১ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় তিনি স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়। জিন্নাহর এই ঘোষণার প্রতিবাদে জনসভার কোনো কোনো অংশে মৃদু 'নো', 'নো' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। উক্ত জনসভার তিন দিন পর (২৪ মার্চ, ১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ভাষণে তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা অবশ্যই হবে উর্দু। জিন্নাহর এ উক্তির তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে উপস্থিত গ্রাজুয়েটবৃন্দ 'না', 'না' ধ্বনি উচ্চারণ করে। জিন্নাহর ঘোষণায় পাকিস্তান সরকারের প্রতি পূর্ববাংলার মানুষের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি হয়। ফলে ভাষার আন্দোলন ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ২৪ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক প্রতিনিধিদল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং জিন্নাহর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।

জিন্নাহর পূর্ববাংলা সফর ভাষা-আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেয়। তাঁর জনপ্রিয়তা এবং তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের অগাধ শ্রদ্ধাবোধ অনেক আন্দোলনকারীকে আন্দোলন থেকে সরিয়ে ফেলে। এমনিক তমাদ্দুন মজলিশও আন্দোলনের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে। তবে ভাষার জন্য ছাত্রদের মনে ক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ছাত্ররা ১৯৪৮ এর পর থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত প্রতি বছর ১১ মার্চ পালন করতেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে ভাষা আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয়। পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ২৭ জানুয়ারি (১৯৫২) এক জনসভায় ঘোষণা দেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তাঁর এই ঘোষণায় ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। খাজা নাজিমউদ্দীনের উক্তির প্রতিবাদে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ জানুয়ারি (১৯৫২) ছাত্র ধর্মঘট ও সভা আহবান করে। ৩০ জানুয়ারির সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকা শহরে ছাত্রধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্রসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভাষা আন্দোলনকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ৩১ জানুয়ারি বিকেলে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে একটি সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা ভাসানী। সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, তমাদ্দুন মজলিশ, ইসলামী ছাত্রসংঘ, যুবসংঘ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ২৮ মতান্তরে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। উক্ত পরিষদ ৪ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি সমর্থন করে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, বিক্ষোভ ও সভার কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২১ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করার কারণ ছিল এই যে, ঐদিন পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছিল। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনা ছিল ঐ অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হবে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচির প্রতি প্রাদেশিক সরকার কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করে। ১২ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের সমর্থক ইংরেজি পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার' নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে এক মাসের জন্য সমস্ত ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ১৪৪ ধারা জারি করার অর্থ একসঙ্গে ৪ জনের বেশি লোকের সমাগম, মিছিল, শোভাযাত্রা, সভা ও সমাবেশ করা আইনবিরোধী।

সরকারি ঘোষণায় ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং তাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলি

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার, ৮ ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা জমায়েত হতে থাকে। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররা দুজন দুজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে থাকে। বেলা ১১ টায় ছাত্রসভা শুরু হয়। সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৪৪ ধারা ভাঙার পন্থা হিসেবে দশজন দশজন করে ছাত্র রাস্তায় মিছিল বের করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অনেকেই এদিন গ্রেফতার হন। পুলিশ মিছিলকারীদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। কিন্তু সব বাধা উপেক্ষা করে ছাত্ররা মেডিকেল হোস্টেলের প্রধান ফটকের কাছে জমায়েত হন। মেডিকেল হোস্টেলের নিকটেই ছিল জগন্নাথ হলের অডিটোরিয়াম যেখানে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের সভা বসত। আন্দোলনকারী ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববাংলা আইন পরিষদে যোগদানকারী সদস্যদের কাছে বাংলা ভাষার দাবির কথা পৌঁছে দেয়া যেন তাঁরা অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করেন।

ছাত্ররা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে জমায়েত হতে থাকে। বেলা সোয়া তিনটার দিকে এম.এল.এ. এবং মন্ত্রীরা মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদে আসতে থাকেন। তখন ছাত্ররা দলবদ্ধ হয়ে শ্লোগান দিতে থাকলে পুলিশ বাহিনী এসে তাদের তাড়া করে এবং ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। প্রতিবাদে ছাত্ররা ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। একদিকে ইট পাটকেল, আর অন্য দিক থেকে তার পরিবর্তে কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠি চার্জ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্রদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলেই আব্দুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন আহমদ শহীদ হন। ১৭ জনের মত গুরুতর আহত হয়। তাদের মধ্যে রাত আটটায় আবুল বরকত শহীদ হন। গুলি চালানোর সংবাদ দাবানলের মতো শহরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদে বিভিন্ন অফিস থেকে কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেরিয়ে আসে।

শহীদ সালাম

শহীদ রফিক

শহীদ জব্বার

শহীদ বরকত

২১ ফেব্রয়ারিতে পুলিশের গুলিতে আহত কেউ কেউ ঘটনার বেশ কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন। যেমন সালাম মৃত্যুবরণ করেন ৭ এপ্রিল (১৯৫২)। আবার ২১ ফেব্রুয়ারির প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি যে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় সেই মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়েও কেউ কেউ শহীদ হন। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনায় উক্ত দিন ও পরে কমপক্ষে ৬ জন যে শহীদ হয়েছিলেন সে বিষয়ে সরকারি বিবরণী অনুযায়ী নিশ্চিত হওয়া যায়।

একুশে ফেব্রুয়ারির পরের ঘটনাবলি

২১ ফেব্রুয়ারির হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হরতাল পালিত হয়। প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে ২ জন মৃত্যুবরণ করে। ২১ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি চারদিন 'ঢাকা বেতার কেন্দ্রে' পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। এই কয়দিন কেবল সংবাদ বুলেটিন ছাড়া অন্য কোনো অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়নি। একুশের ঘটনার প্রতিবাদে দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদদের স্মরণে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করেন (২৩ ফেব্রুয়ারি)। ড. সাঈদ হায়দার নকশার পরিকল্পনা করেন। শহীদ শফিউরের পিতা ২৪ তারিখে শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ সেই মিনারটি ভেঙ্গে ফেলে।

একুশে ফেব্রুয়ারির পর সরকার জেল-জুলুমের নীতি অবলম্বন করে। চারজন গণপরিষদ সদস্যকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককেও (যেমন প্রক্টর অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ড. বি.সি. চক্রবর্তী, অজিত কুমার গুহ প্রমুখ) গ্রেপ্তার করে।

জাতীয় শহীদ মিনার

সারাদেশে ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত অনেক নেতা গ্রেপ্তার হন। জেল-জুলুমের ভয়ে অনেক রাজনৈতিক নেতা আত্মগোপন করেন। ফলে ভাষা আন্দোলন স্থবির হয়ে পড়ে। তবে ১৯৫২ সালের পর প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হতে থাকে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে উর্দু ও বাংলাকে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে অনুমোদন করা হয়।

ভাষা আন্দোলনের প্রভাব

১। **রাজনৈতিক প্রভাব:** ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। অনেক রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদ এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ফলে পূর্ববাংলায় স্বাধিকারের চিন্তাচেতনা শুরু হয়। পরবর্তী আন্দোলনসমূহে ভাষা আন্দোলন প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। ভাষা আন্দোলন একধরনের প্রাদেশিকতাবাদের জন্ম দেয়। এরপর যখনই পূর্ববাংলার স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো দাবি উচ্চারণ করা হয়েছে তখনই পূর্ববাংলাবাসীর সমর্থন অর্জন করেছে।

২। **বিভিন্ন দাবিদাওয়ার উন্মেষ:** ভাষা আন্দোলনের সময় কেন্দ্রীয় গণপরিষদে পূর্ববাংলার জনসংখ্যানুপাতিক আসনসংখ্যা দাবি করা হয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়। কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে বাঙালিদেরকে অধিকসংখ্যক নিয়োগ দেয়ার দাবি করা হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ঘটানোর দাবি করা হয়।

৩। **বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি ও মুসলিম লীগের পতনের সূচনা:** বাংলা ভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগের বৈরী মনোভাবের কারণে এই দল থেকে গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রভৃতি নতুন নতুন দলের সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের প্রাধান্য খর্ব হয়। ফলে ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এই দলের চরম পরাজয় ঘটে।

৪। **ছাত্রসমাজের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উত্থান:** ভাষা আন্দোলন ছাত্রসমাজকে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। ছাত্ররা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের মাত্র দুইমাসের মধ্যেই (এপ্রিল, ১৯৫২) 'পূর্ববাংলায় 'ছাত্র ইউনিয়ন' নামে ছাত্র সংগঠন জন্মলাভ করে। পরবর্তীকালের আন্দোলনসমূহে ছাত্রসমাজই ছিল মূল শক্তি।

৫। **বাঙালির ঐক্যসৃষ্টি:** ভাষা আন্দোলন ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কর্মচারী প্রভৃতি সকল পেশার লোকদের মধ্যে ঐক্যের এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। পরবর্তী আন্দোলনসমূহে আমরা তার পুনরাবৃত্তি দেখি।

৬। **অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা:** ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা হয়। ভাষা আন্দোলনের সময় পার্লামেন্টের মধ্যে কংগ্রেস দলীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ ভাষার দাবিতে কথা বলেছেন, আর রাজপথে অকংগ্রেসীয়রা ধর্মীয় ভাঁওতাবাজির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। ফলে পূর্ববাংলায় হিন্দ-মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ দলটির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ করা হয়। ফলে এ ভূখণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূত্রপাত হয়।

৭। **বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠা:** ভাষা আন্দোলনের ফলে ১৯৫৫-তে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে) ও বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত (বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে) হয়।

৮। **নারী জাগরণের সূচনা:** ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এর ফলে ছাত্রীদের বোরখা পরার অভ্যাস কমে যায়। পরবর্তী সভা সমিতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণের ধারা সৃষ্টি হয়। রাজনীতিতেও মেয়েরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে থাকে।

৯। **ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা:** ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা আমাদের মুক্তিসংগ্রামের অনুপ্রেরণা। ভাষা আন্দোলন থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে।

১০। **একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ:** ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এই স্বীকৃতি ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা বেড়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	• শিক্ষার্থীগণ "ভাষা আন্দোলন" শীর্ষক নিবন্ধ লিখে টিউটর মহোদয়কে দেখাবেন। • শিক্ষার্থীরা, "ভাষা আন্দোলন ও এর প্রভাব" বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করবেন। • একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ করতে পারবেন।

সারসংক্ষেপ

- ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আলোচনার সূত্রপাত হয়। পাকিস্তান সরকার বাংলাভাষাকে উপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করলে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়।
- পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব বাংলা সফরের সময় ২১ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকে সরকারি ভাষা করার ঘোষণা দিলে তার প্রতিবাদ করা হয়।
- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে আন্দোলন করতে যেয়ে ৬ জন শহীদ হন।
- ভাষা আন্দোলন থেকে বাঙালি জাতিয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনে ভাষা আন্দোলন অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।
- বাংলা ভাষার প্রতি হটকারী সিদ্ধান্তের ফলে মুসলিম লীগের পতন ঘটে।
- রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ছাত্র সমাজের উত্থান ঘটে।
- অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও নারী জাগরণের সূচনা ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যবর্তী দূরত্ব-

ক) ১৩০০ কিলোমিটার খ) ১৫০০ কিলোমিটার
গ) ১৫০০ কিলোমিটার ঘ) ১৬০০ কিলোমিটার

২। ১৯৪৭ সালে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের উভয় অংশের মধ্যে পার্থক্য ছিল–
i) ধর্মীয় ii) ভাষাগত iii) সাংস্কৃতিক
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। কত সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়?

ক) ১৪ আগস্ট পাকিস্তান, ১৫ আগস্ট ভারত ১৯৪৭ খ) ১৪ আগস্ট ভারত, ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ১৯৪৭
গ) ১৩ আগস্ট পাকিস্তান ১৪ আগস্ট ভারত ১৯৪৭ ঘ) ১৫ আগস্ট ভারত ১৬ আগস্ট পাকিস্তান ১৯৪৭

৪। পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? (জ্ঞানমূলক)

ক) আবুল হাশিম খ) মাওলানা আকরাম খান
গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ) খাজা নাজিমউদ্দিন

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক

নীচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

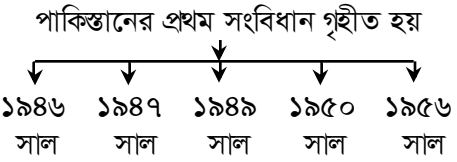

৫। অনুচ্ছেদে/চিত্রে কোনটি পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনার সাল নির্দেশ করে–

ক) ১৯৪৬ খ) ১৯৪৭

গ) ১৯৫০ ঘ) ১৯৫৬

৬। ১৯৪৭ সাল গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার জন্য যুক্তিযুক্ত কারন–

ক) ভারত বিভক্ত হয় খ) পাকিস্তান বিভক্ত হয়

গ) বাংলার অখন্ডতা রক্ষা পায় ঘ) সংবিধান প্রণয়ন করা হয়

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন–

ঝর্ণা বইমেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাউল গান শুনছিল। একজন শ্রোতা হিন্দি গান গাওয়ার অনুরোধ জানালে ঝর্ণা তার প্রতিবাদ করে বলে এ অনুষ্ঠানে বাংলা ছাড়া অন্য গান পরিবেশিত হবে না।

৭। ঝর্ণার কর্মকান্ডে পাঠ্য বইয়ের কোন আন্দোলনের প্রভাব রয়েছে (প্রয়োগমূলক)

ক) অসহযোগ খ) খিলাফত

গ) ভাষা ঘ) ছয় দফা

৮। ঝর্ণার মনোভাবে ফুটে উঠেছে-

i) ভাষার প্রতি মমত্ববোধ ii) দেশাত্ববোধ iii) বিদেশী সংস্কৃতিবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯। পূর্ববাংলা আইন পরিষদের সভা কোথায় অনুষ্ঠিত হতো–

ক) ঢাকা মেডিকেলের হোস্টেলে খ) জগন্নাথ হলের অডিটরিয়ামে

গ) সংসদ ভবনে ঘ) কার্জন হলে

১০। ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় কখন?

ক) ১৯৯৬ খ্রিঃ খ) ১৯৯৭ খ্রিঃ

গ) ১৯৯৮ খ্রিঃ ঘ) ১৯৯৯ খ্রিঃ

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনপ্রিয় সংঘ সভাপতি হরমুজ সাহেবের অবস্থান সর্বদাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিপক্ষে। তার মতে যে ছাত্ররা আন্দোলন করে মায়ের মুখের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, তারাই আবার ভবিষ্যতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঝাপিয়ে পড়বে।

ক. উর্দু এবং শুধু উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা-কোথায় এ ঘোষণা দেওয়া হয়?

খ. "তমাদ্দুন মজলিশ" গঠিত হয় কেন?

গ. হুরমুজ সাহেবের বক্তব্যে যে আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে পাঠ্য বইয়ের আলোকে তার পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উক্ত আন্দোলনই জন্ম দেয় স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন- আপনার উত্তরের স্বপক্ষে মতামত প্রকাশ করুন।

পাঠ-১৩.২ যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;
- যুক্তফ্রন্ট ঘোষিত ২১ দফা দাবির বিবরণ দিতে পারবেন;
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ, নির্বাচন পদ্ধতি, যুক্তফ্রন্ট গঠন, আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইছলামী, গণতন্ত্রী দল, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন।

ভূমিকা

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নাম ছিল পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ। অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। সেই নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে যাদের নির্বাচনী এলাকা নবগঠিত পূর্ববাংলা প্রদেশের মধ্যে ছিল তারা ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যে পরিণত হন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ১৯৫২ সালে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে প্রাদেশিক পরিষদের একটি উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী পরাজিত হওয়ায় পূর্ববাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার আর কোনো নির্বাচন মোকাবিলা করতে ভয় পান। ফলে সরকার কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে আইন পাশের মাধ্যমে নির্বাচন পেছানোর কৌশল অবলম্বন করে। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পটভূমি

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ আমলে প্রদেশের শাসন বিভাগ ও আইনসভা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল। কিন্তু স্বাধীন পাকিস্তানে শুরু থেকেই কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা হয় এবং প্রদেশের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা হয়। প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করতেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল। প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদের গঠন, দায়িত্ব বণ্টন ও কার্যকাল বিষয়েও গভর্নরের উপর গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এমনকি প্রদেশের কোনো অংশে শান্তি ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হলে গভর্নর জেনারেল সেই প্রদেশে গভর্নরের শাসন জারি করতে পারতেন। প্রদেশের আমলারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তারা প্রাদেশিক সরকারের আদেশ নিষেধ মানতেন না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আমলা গোষ্ঠিতে পূর্ববাংলার কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলা সচিবালয়ে কোনো বাঙালি সচিব ছিলেন না। অবাঙালি সচিবগণ পূর্ববাংলার স্বার্থ দেখতেন না। দেশের সেনাবাহিনী, পররাষ্ট্র দপ্তর ও কূটনৈতিক অফিসগুলোতেও পূর্ববাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ১৯৫৬ সালে দেশের সেনাবাহিনীতে মেজর থেকে জেনারেল পর্যন্ত মোট ৬০০ জন অফিসারের মধ্যে মাত্র ১০ জন ছিলেন বাঙালি। অর্থনৈতিক দিকেও প্রদেশের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার পর আয়কর পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যায়। বিক্রয় কর, যা ব্রিটিশ আমলে প্রদেশের হাতে ছিল তা ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে। ১৯৪৭-১৯৫৪ সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে পূর্ববাংলায় ব্যয় করেছে ৪২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা, একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। বিদেশি সাহায্যের তেরভাগের একভাগ মাত্র পূর্ববাংলায় দেয়া হয়। এভাবে পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে অর্থনেতিক উন্নয়নে বিশাল বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

এসব বৈষম্য এবং বাংলা ভাষার আন্দোলন পূর্ববাংলার মানুষের মনে মুসলিম লীগ ও সরকারের প্রতি ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করে। পূর্ববাংলায় অধিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার হয়।

এমনি প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচন পদ্ধতি

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে উল্লিখিত প্রাদেশিক নির্বাচন পদ্ধতি ১৯৫২ সালে সংশোধন করে যে বিধি করা হয় তা নিম্নরূপ:

ক. নির্বাচন হবে ২১ বৎসর বয়স্ক সকল নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে।
খ. অমুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে।
গ. পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের আসন সংখ্যা হবে ৩০৯টি (১২টি মহিলা আসনসহ)। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন বণ্টন করা হবে নিম্নরূপভাবে:

১) মুসলমান আসন	২৩৭টি (৯টি মহিলা আসনসহ)
২) সাধারণ বর্ণ হিন্দু	৩১টি (১টি মহিলা আসনসহ)
৩) তফশিলি জাতি হিন্দু	৩৮টি (২টি মহিলা আসনসহ)
৪) বৌদ্ধ	২টি
৫) খ্রিস্টান	১টি
	সর্বমোট ৩০৯টি (১২টি মহিলা আসনসহ)

ঘ. মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যতিরেকে অন্য আসনেও মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। মহিলাদের জন্য যে ১২টি আসন সংরক্ষিত ছিল সে আসনসমূহের নির্বাচনে কেবল মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মহিলাদেরই ভোটদানের অধিকার ছিল।

ভোটার সংখ্যা, নির্বাচনী তফশিল ও অন্যান্য তথ্য

১৯৫১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টকে ভিত্তি করে আসন বণ্টন করা হয়। আনুমানিক ১ লক্ষ ৪০ হাজার অধিবাসীর জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট করা হয়। ১৯৫৩ সালের ১ জানুয়ারি যাদের বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হয়েছিল তারা ভোটার হওয়ার যোগ্য ছিলেন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩। ১৯৫৪ সালের ১ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরু হয়। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ছিল ১৪ জানুয়ারি ১৯৫৪। মনোনয়নপত্র বাছাই ১৬, ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি (১৯৫৪) এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ছিল ২১ জানুয়ারি (১৯৫৪)।

ছাপানো কিংবা টাইপ করা কিংবা হাতে লেখা ফরমে মনোনয়ন জমা দেওয়ার নিয়ম করা হয়। তফশিলি নির্বাচনী এলাকা ছাড়া প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীগণকে ২৫০ টাকা জামানত দাখিল করতে হত। তফশিলি নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীগণের জামানত ছিল ১০০ টাকা।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের ব্যালট বাক্সে ব্যবহারের জন্য সরকার চূড়ান্তরূপে মোট ২৪টি প্রতীক নির্দিষ্ট করেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ 'হারিকেন' প্রতীক এবং যুক্তফ্রন্ট 'নৌকা' প্রতীক গ্রহণ করে। ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারকে পাঁচ মাইলের বেশি হাঁটতে না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে বুথ প্রতিষ্ঠা করা হয়। গেজেটেড অফিসার, কলেজের প্রফেসর, হাই স্কুল ও হাইমাদরাসার প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার নিযুক্ত করা হয়। কোনো ভোটার যাতে একবারের বেশি ভোট দিতে না পারে সেজন্য ভোটদান কালে তার আঙুলে অমোচনীয় (যা সহজে ওঠেনা) কালির ছাপ দেওয়ার বিধান করা হয়।

ভোটগ্রহণ ৮ মার্চ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত ৫ দিনে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নির্বাচন কমিশনার ছিলেন মো. আজফার।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ও জোট

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে। মুসলমান আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মুসলিম লীগ, পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলামী, যুবলীগ, গণতন্ত্রী দল, খেলাফতে রব্বানী পার্টি প্রভৃতি। অমুসলমান আসনে অংশগ্রহণ করে : পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তফশিলি ফেডারেশন, গণসমিতি, অভয় আশ্রম (কুমিল্লা), পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল প্রভৃতি।

কমিউনিস্ট পার্টির মুসলমান সদস্যগণ মুসলমান আসনে এবং হিন্দু সদস্যগণ হিন্দু আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

মুসলমান আসনে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং নেজামে ইসলামী 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে সম্মিলিতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। হিন্দু আসনে গণসমিতি, অভয় আশ্রম ও পূর্ব পাকিস্তান সমাজতান্ত্রিক দল 'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটানোর উদ্দেশে পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শৃমিক পার্টি ও নেজামে ইসলামী মিলে 'যুক্তফ্রন্ট' নামক একটি নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তোলে। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুবলীগের উদ্যোগে মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিরোধী দলের ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। তখন 'গণতান্ত্রিক দল' ও 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' ঐ উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম লীগ বিরোধী জোট গঠন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা জারির সংগে সংগে এ.কে. ফজলুল হক নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁর নিজস্ব কৃষক প্রজা পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং নামকরণ করেন কৃষক শ্রমিক পার্টি। ১৯৫৩ সালে ২৬ নভেম্বর পূর্বপাক জমিয়তে ওলামায়ে ইছলাম নামক ধর্মীয় সংগঠনটিকে রাজনৈতিক দলে পরিণত করে এর নামকরণ করা হয় 'নেজামে ইছলামী'।

অবশেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইছলামীর সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যদিও যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, গণতন্ত্রী দল ও যুবলীগ, কিন্তু ফ্রন্টের কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইছলামীর নেতৃবৃন্দের বিরোধিতায় এই দলগুলোকে ফ্রন্টভুক্ত করা হয়নি। তবে গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মুসলমান সদস্যগণ আওয়ামী মুসলিম লীগের নামে নমিনেশন লাভ করেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, ১৫ জন যুবলীগ সদস্য, ১০ জন গণতন্ত্রী দলের সদস্য এবং ১০ জন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য আওয়ামী লীগের পরিচয়ে যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন লাভে সমর্থ হন। অনেক বামপন্থী নেতা স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন দল ও জোট নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করে। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রেরণাশক্তি ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। তাই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ২১ ফিগারটিকে চিরস্মরণীয় করার জন্য ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। আবুল মনসুর আহমেদ ২১ দফার খসড়া প্রণয়ন করেন। ২১ দফার দাবিগুলো ভোটারদের মন জয় করে।

নির্বাচনী ফলাফল

নির্বাচনে মুসলমান আসনে ৩৭.৬০% ভোট পড়ে। তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরবস্থা, মহিলাদের ভোটকেন্দ্রে আসতে অনীহা প্রভৃতি কারণে ভোটদানের হার কম ছিল। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হয় ২ এপ্রিল।

নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলমান আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২১৫টি, মুসলিম লীগ ৯টি, খেলাফতে রব্বানী পার্টি ১টি এবং স্বতন্ত্র ১২টি আসন। মুসলমান আসনে স্বতন্ত্র সদস্যদের মধ্যে ৮ জন যুক্তফ্রন্টে ও ১ জন মুসলিম লীগে যোগদান করেন। যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলোর মধ্যে আসনসংখ্যা নিম্নরূপ হয়: আওয়ামী লীগ ১৪২, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ৪৮, নেজামে ইসলামী ১৯, গণতন্ত্রী দল ১৩ (১টি আসনে দলীয় পরিচয় অস্পষ্ট)। ৭২টি অমুসলমান আসনের ২৪টিতে জাতীয় কংগ্রেস, ২৭টিতে তফশিলি ফেডারেশন (রসরাজ মন্ডল গ্রুপ), সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট ১৩টি (এর মধ্যে গণতন্ত্রী দল ৩টি)। কমিউনিস্ট পার্টি ৪টি, বৌদ্ধ ২টি, খ্রিস্টান ১টি এবং স্বতন্ত্র ১টি আসনে জয়লাভ করে।

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

১. ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট শাসনক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর দলের নেতৃবৃন্দ নিজেদের ভাগ্যগড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা জনগণের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করেন, ফলে দলটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মুসলিম লীগের অনেক জনপ্রিয় নেতা ও সদস্য বিভিন্ন কারণে দলত্যাগ করেন এবং নতুন দল (আওয়ামী মুসলিম লীগ) গঠন করেন। ফলে মুসলিম লীগ সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. বাংলা ভাষার দাবির প্রতি অবিচার, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নূরুল আমিন সরকারের দমন নীতি বাংলার আপামর জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

৩. পূর্ব বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক নীতি, সমদর্শিতার অভাব, অবিচার ও শোষণ নীতির প্রভাব নির্বাচনে পড়ে।

৪. দীর্ঘ ৭ বৎসর সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রদেশবাসীর নিকট দলের গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়।

৫. লবণ, কেরোসিন ও সরিষার তেল প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহবধূরাও মুসলিম লীগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তারা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়।

নির্বাচনের গুরুত্ব

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের গুরুত্ব অত্যধিক। পূর্ববাংলায় এটি ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচন ছিল অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ। নির্বাচনে সরকারি দলের এমন শোচনীয় পরাজয় ছিল বিরল ঘটনা। পূর্ববাংলার তৎকালীন সরকার নির্বাচনে পরাজয়ের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেন, কিন্তু নির্বাচনে কারচুপির চেষ্টা করেননি। এই নির্বাচনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছিল এবং তারা উক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার দাবির সপক্ষে ভোট দিয়ে জনগণ পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের ফলে পাকিস্তান গণপরিষদে উক্ত দলের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায়, ফলে পাকিস্তানে কোয়ালিশন সরকার গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পূর্ববাংলায় সেই যে মুসলিম লীগের পতন ঘটলো, এরপর আর কখনো এখানে মুসলিম লীগ দল শক্তিশালী হতে পারেনি।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনামল (১৯৫৪-৫৮)

যুক্তফ্রন্ট গঠনের সময় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, নির্বাচনে জয়লাভ করলে এ. কে. ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি বোর্ডের নেতা নির্বাচিত হবেন। সে অনুযায়ী তিনি পূর্ববাংলায় সরকার গঠনের আমন্ত্রণ পান। কিন্তু শুরুতেই মন্ত্রীপরিষদ গঠন নিয়ে মনোমালিন্য শুরু হয়। ফজলুল হক আওয়ামী মুসলিম লীগ মনোনীত সদস্যদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ও আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি। তাই তিনি আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে ৩ এপ্রিল (১৯৫৪) মন্ত্রিসভা গঠন করেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় কেন্দ্রীয় সরকার সুনজরে দেখেনি। তারা যুক্তফ্রন্টের ভাঙন চেয়েছে। মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের সংগে মনোমালিন্য, ৩০ এপ্রিল কোলকাতায় ফজলুল হক প্রদত্ত ভাষণের অপব্যাখ্যা, পূর্ববাংলার বিভিন্ন শিল্প কলকারখানার বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে সংঘটিত দাঙ্গা প্রভৃতি ফজলুল হককে বেকায়দায় ফেলে। তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে আপোষ করে এই দলের কিছু সদস্যকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন (১৫ মে, ১৯৫৪)। কিন্তু তাঁর মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। 'নিউইয়র্ক টাইমস' এর সংবাদদাতা জন পি. কালাহান এ.কে. ফজলুল হকের সাক্ষাতকার বিকৃত করে প্রকাশ করেন। উক্ত সাক্ষাতকারে ফজলুল হক পূর্ববাংলার অধিক স্বায়ত্তশাসন পাওয়া উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু কালাহান লেখেন যে, ফজলুল হক পূর্ববাংলার স্বাধীনতা চান। কেন্দ্রীয় সরকার কালাহানের রিপোর্টের ভিত্তিতে ফজলুল হককে দেশদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করে এবং তাঁর মন্ত্রিসভা বাতিল করে (২৯ মে, ১৯৫৪) প্রদেশের ওপর গভর্নরের শাসন জারি করে। পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন চলে ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত। ১৭ মে থেকে ২৫ অক্টোবর (১৯৫৪) পর্যন্ত গভর্নর ছিলেন ইস্কান্দার মীর্জা। তিনি পূর্ব বাংলায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। গভর্নরের শাসনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ১ জন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান, ১৩ জন নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও ৬৫৯ জন যুক্তফ্রন্ট কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ফজলুল হককে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অনেক বামপন্থী নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু যে ফজলুল হককে দেশদ্রোহী আখ্যা দেয়া হয়েছিল তাকেই পদচ্যুত করার ২ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে ফজলুল হক কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আঁতাত করেন এবং যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী মুসলিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর দলের আবু হোসেন সরকারকে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৫৫ সালে দলের

নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে দলটিকে অসাম্প্রদায়িক করে। আতাউর রহমান খানকে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের নেতা নির্বাচিত করা হয়। এরপর শুরু হয় পূর্ববাংলায় সরকার বদলের পালা। কখনো আবু হোসেন সরকারের কৃষক-শ্রমিক পার্টির সরকার, কখনো আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সরকার। এক পর্যায়ে কেন্দ্রে এবং প্রদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার অংশীদার হয়। কেন্দ্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন (১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ থেকে ১৮ অক্টোবর ১৯৫৭) এবং প্রদেশে আতাউর রহমান খান সরকার গঠন করেন (৬.৯.৫৬ থেকে ৩১.৩.৫৮)। একই সংগে কেন্দ্রে এবং প্রদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার অংশীদার হওয়ায় আওয়ামী লীগ সরকার পূর্ববাংলায় অনেক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

আওয়ামী লীগের শাসনামলে পূর্ববাংলার উন্নয়ন

পূর্ববাংলার ২ বৎসরের শাসনামলে আওয়ামী লীগ সরকার ফেঞ্চুগঞ্জে গ্যাস কারখানা স্থাপন করে; সাভারে ডেয়ারি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে; ঢাকা আরিচা, নগরবাড়ি-রাজশাহী এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম যোগাযোগ সড়ক নির্মাণ করে; ঢাকা শহরে রমনা পার্ক গড়ে তোলে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ সুবিধার জন্য ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (ওয়াপদা) প্রতিষ্ঠা করে; ঢাকায় প্রথম চলচ্চিত্র স্টুডিও এফ.ডি.সি. (ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন) প্রতিষ্ঠা করে। সরকার ভাষা শহীদদের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। বাংলা একাডেমি বাংলায় পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সরকারের স্বল্পকালীন শাসনামলে আরো যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: প্লানিং বোর্ড গঠন, তিন বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৯৫৭-৬০) প্রণয়ন, শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন, ঢাকা আলিয়া মাদরাসা ভবন নির্মাণের জন্য প্রথমবারের মতো চল্লিশ লক্ষ টাকা আনুমোদন, ময়মনসিংহে পশু চিকিৎসা কলেজ স্থাপন, কৃষিঋণ সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল, বন উন্নয়ন, স্থায়ী শিল্প ট্রাইবুনাল গঠন, ঢাকা শহরের উন্নয়নের জন্য ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা এবং গ্রেটার ঢাকা সিটি মাস্টার প্লান প্রণয়ন ইত্যাদি।

আইন পরিষদের কলঙ্কজনক ঘটনা

১৯৫৪ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ে প্রদেশে সাতটি মন্ত্রিসভা ও তিনবার গভর্নরের শাসন চালু হয়। এই সময়ে আইন পরিষদও কার্যকর হয়নি। আইন পরিষদের স্পিকার (জনাব আবদুল হাকিম) ছিলেন কৃষক শ্রমিক পার্টির এবং ডেপুটি স্পিকার (জনাব শাহেদ আলী) ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয়। যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে কখনো কৃষক-শ্রমিক পার্টির সরকার আবার কখনো আওয়ামী লীগের সরকার দেশ পরিচালনা করে। ১৯৫৮ সালে আওয়ামী লীগ অভিযোগ উত্থাপন করে যে, স্পিকার আবদুল হাকিম নিরপেক্ষ নন। এরই প্রেক্ষিতে ২০ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্যবৃন্দ এই সিদ্ধান্ত মানেনি। ২৩ সেপ্টেম্বর ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলী স্পিকারের চেয়ারে বসামাত্র কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও তাঁর সমর্থক দলের সদস্যবৃন্দ তাঁকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন বস্তু নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে তিনি মুখে আঘাত পান। আহত অবস্থায় শাহেদ আলীকে হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে তিনি ২৫ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) বেলা ১:২০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন।
এই ঘটনার পর ৭ অক্টোবর (১৯৫৮) পাকিস্তানে সামারিক আইন জারি করা হলে পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির অবসান ঘটে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	• শিক্ষার্থীগণ যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা বিশ্লেষণ করে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিবেন। • ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ নির্বাচনের পদ্ধতি ও নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনার জন্য একটি পাঠচক্র আয়োজন করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

- পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে।
- নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করার লক্ষ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলামী দলগুলির সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।
- যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা নির্বাচনী মেনিফেস্টো ঘোষণা করে।

- নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছিল। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের পরাজয় ঘটে।
- নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তখন প্রদেশে অনেক উন্নয়ন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্র জনতার আন্দোলনে অংশগ্রহনের পিছনে কোনটি কাজ করেছে–
ক) আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রচারণা খ) তমাদ্দুন মজলিশের কর্মকাণ্ড
গ) নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাঙালীর ঐক্যবদ্ধ চেতনা ঘ) মুসলিম লীগের দমন নীতি

২। ১৯৫৪ সালে কতটি আসনে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন হয়েছিল–
ক) ২৩৭ খ) ২৯৭
গ) ৩০৯ ঘ) ৩১০

৩। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল কেন? (অনুধাবন)
ক) জনগণকে আশ্বাস দেয়ার জন্য খ) সরকার বিরোধি প্রচারনায় ২১ সহায়ক ছিল বলে
গ) একুশে ফেব্রুয়ারিকে চির অম্লান রাখার জন্য ঘ) একুশ সংখ্যাটি মঙ্গলজনক ছিল বলে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫, ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার সমমনা দলগুলো নিয়ে মহাজোট গঠন করে। নির্বাচনে মহাজোট জয়লাভ করে।

৪। উদ্দীপকের মহাজোট পাঠ্য বইয়ের পঞ্চাশের দশকে কোন জোট গঠনের সাথে মিলে যায়
ক) আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন খ) গণতন্ত্রী দল গঠন
গ) যুক্তফ্রন্ট গঠন ঘ) মুসলিম লীগ গঠন

৫। উক্ত জোট গঠনের পর নির্বাচনের ফলাফল কী ছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক) যুবলীগের জয়লাভ খ) যুক্ত ফ্রন্টের জয়লাভ
গ) মুসলিম লীগের জয়লাভ ঘ) গণতন্ত্রী দলের জয়লাভ

৬। লিরা লিজাকে যুক্তফ্রন্ট গঠন সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন। যুক্তফ্রন্টে যে দলগুলো অংশগ্রহণ করেছিল–
i) আওয়ামী মুসলিম লীগ ও গণতন্ত্রীদল
ii) কৃষক শ্রমিক পার্টি
iii) নেজামে ইসলামী

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

নবম শ্রেণির ছাত্র আনন্ত দাদার কাছে শুনেছে শুধু আঞ্চলিক কারণে একটি দেশের শাসক দলের ত্যাগী নেতারা উপেক্ষিত হয়। তারা দেশটির জন্মলগ্নে রেখেছিল প্রভূত অবদান। শাসকদলের এরূপ অগণতান্ত্রিক কাজ তাদের দলটিকে জন বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল।

ক. যুক্তফ্রন্ট মূলত কয়টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত?
খ. যুক্তফ্রন্ট গঠন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় – ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে দলটির কর্মকান্ড পাঠ্য বইয়ের পাকিস্তানের যে দলের কর্মকান্ডে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে দলের কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উক্ত দলটির নেতাদের আচরণে সৃষ্টি হয়েছিল "আওয়ামী মুসলিম লীগ" – মতামত দিন।

পাঠ-১৩.৩ সামরিক শাসন ও আইয়ুবীয় স্বৈরাচার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির প্রেক্ষাপট বলতে পারবেন;
- সামরিক সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচির বিবরণ দিতে পারবেন;
- ১৯৬২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- আইয়ুব বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনের ইতিহাস মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আইয়ুব খান, সামরিক শাসন, এবডো, রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী, ছায়ানট, মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ (১৯৬১), মৌলিক গণতন্ত্র, সংবিধান, শিক্ষা কমিশন, শিক্ষা আন্দোলন, সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ)।

ভূমিকা

আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর মধ্যে প্রথম সাড়ে তিন বছর (২৭.১০.১৯৫৮ থেকে ৮.৬.১৯৬২) সামরিক এবং পরবর্তী ৭ বছর বেসামরিক শাসক হিসেবে পাকিস্তান শাসন করেন। তিনি স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনামলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। এর প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে ৬ দফা ভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তা স্বাধীনতার আন্দালনে পরিণত হয় এবং আইয়ুব খানের পতন ঘটে। আমরা এ অধ্যায়ে আইয়ুবের সামরিক শাসন আমল পর্যালোচনা করব।

আইয়ুবের সামরিক শাসন ১৯৫৮-১৯৬২

সামরিক শাসনের অর্থ হলো, বেসামরিক কর্তৃত্ব বিলোপ। সামরিক শাসন জারি হলে সামরিক বাহিনীর অধীনে সবাইকে কাজ করতে হয়। সামরিক শাসনের অধীনে সংবিধান কখনও বাতিল করা হয়, কখনো বা স্থগিত রাখা হয়। সামরিক শাসন হলো প্রচলিত আইন-বিরোধী, দায়-দায়িত্বহীন ও উৎপীড়নমূলক।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাত ১০:৩০ মিনিটে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইসকান্দার মীর্জা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মালিক ফিরোজ খান নুনের সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন। ৭ অক্টোবরের ফরমান বলে ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন, ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহকে বরখাস্ত করেন, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহ ভেঙে দেন, রাজনৈতিক দলসমূহ বিলুপ্ত করেন, মৌলিক অধিকার কেড়ে নেন। এরপর নিজেই আইয়ুব খান কর্তৃক উৎখাত হয়ে ২৭.১০.৫৮ তারিখে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

আইয়ুব খান

আইয়ুব খান ২৮ অক্টোবর এক ফরমান জারি করে প্রধানন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করেন এবং নিজে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

আইয়ুবের ক্ষমতা দখলের পক্ষে যুক্তি প্রদান

আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন যে, দেশের রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার লড়াই, স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, ব্যাপক চোরাচালান, মজুদদারি, মুনাফাখোরি ইত্যাদির ফলে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেজন্যই সামরিক বাহিনিকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে হয়েছে।

ক্ষমতাগ্রহণের পর গৃহীত নিবর্তনমূলক ব্যবস্থাসমূহ

১. ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যেই ১৫০ জন সাবেক মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, পার্লামেন্টারি প্রেস সেক্রেটারি এবং প্রায় ৬০০ জন সাবেক জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনা হয়।

২. আটক দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালের ৭ অক্টোবর 'নির্বাচিত সংস্থাসমূহ অযোগ্যতা আদেশ ১৯৫৯' (Elective Bodies Disqualification Order 1959) সংক্ষেপে EBDO (এবডো) এবং 'সরকারি পদ লাভের অযোগ্যতা আদেশ', সংক্ষেপে PODO নামক দুটি আদেশ জারি করেন। বিধান করা হয় যে, EBDO বা PODO [Public Office Disqualification Order] এর আওতায় গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ট্রাইবুনালে কেউ অভিযুক্ত হলে তিনি ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে দেশের যে কোনো নির্বাচিত সংস্থার সদস্য হওয়ার অযোগ্য বলে গণ্য হবেন। অভিযুক্তরা অর্থদন্ডেও দন্ডিত হতেন। সামরিক সরকার EBDO এর আওতায় ৮৭ জন বিশিষ্ট নাগরিককে অভিযুক্ত করেন। PODO এর আওতায় পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের ১৩ জন, ফরেন সার্ভিসের ৩ জন, পুলিশ সার্ভিসের ১৫ জন ও প্রাদেশিক সার্ভিসের মোট ১৬৬২ জন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত কিংবা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়।

৩. বাঙালির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভূমিকা পালন করার দায়ে আইয়ুব খান ইত্তেফাক, সংবাদ ও পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা তিনটিকে কালো তালিকাভুক্ত করেন এবং সেগুলিকে সরকারি ও আধাসরকারি বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করেন।

৪. আইয়ুব খান বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি রোমান হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগ নেন (১৯৫৯)। বাংলা একাডেমির তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে 'বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি' গঠিত হয়। কিন্তু বাঙালি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচন্ড বিরোধিতায় আইয়ুবের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

৫. আইয়ুব খান ও তাঁর অনুসারীরা বাংলা ভাষাকে পরিবর্তন করে 'মুসলমানিত্ব' প্রদান করার উদ্দেশ্যে নজরুলের কবিতার শব্দ পরিবর্তন করে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনে বাধার সৃষ্টি করে। সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সামরিক সরকার কে.জি. মোস্তফা, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখকে গ্রেফতার করে। কিন্তু সংস্কৃতিকর্মীদের আটকিয়ে রাখা যায়নি। বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ এবং অধ্যাপক খান সরওয়ার মোর্শেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী' কমিটি। এই কমিটি ছয় দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৯৬৪ সালে ঢাকায় পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়। ১৯৬৭ সালে ছায়ানটের ব্যবস্থাপনায় রমনার বটমূলে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সানজিদা খাতুন গঠন করেন 'ছায়ানট'। মফস্বল শহরেও রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে উদযাপিত হয়। আইয়ুব খান চেয়েছিলেন রাজনীতিবিদরা যেন ক্ষমতায় আসতে না পারেন, সংবাদপত্র যাতে সরকার বিরোধী খবরাখবর না দিতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা বাঙালি সংস্কৃতি যাতে বিকশিত না হয় সেজন্য তিনি নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

সামরিক সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি

১. চোরাকারবারি ও মজুতদারি বিরোধী অভিযান

সামরিক শাসন জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান কিছু চমকপ্রদ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যেমন চোরাকারবারি ও মজুতদারি নিষিদ্ধ করা হয়। চোরাকারবারির সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড এবং মজুতদারির সর্বোচ্চ সাজা ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ড থেকে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত ধার্য করা হয়। আয়কর প্রদানের ব্যাপারে কড়া নির্দেশ জারি করা হয়। সীমান্ত পাহারায় কড়াকড়ি করা হয়। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ভাল ফল পাওয়া যায়।

২. ভূমি সংস্কার

আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই সাত সদস্য বিশিষ্ট ভূমি সংস্কার কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সকল সদস্যই ছিলেন সিভিল সার্ভিসের। সে সময় রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় কোনো রাজনীতিবিদ কমিশনের সামনে মতামত দিতে পারেননি। তবে সংবাদপত্রে ভূমি সংস্কারের পক্ষে সম্পাদকীয় লেখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সমাজ ব্যাপক ভূমি-সংস্কারের পক্ষে মত দেন। সামরিক সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী জমির সর্বোচ্চ সিলিং সেচকৃত জমির জন্য ৫০০ একর এবং অসেচকৃত জমির জন্য ১০০০ একর ধার্য করেন। এই ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ২২ লক্ষ একর জমি দখল করা হয় এবং তা দেড় লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

৩. মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১

আইয়ুব খান ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারি করেন। এই আইনে উত্তরাধিকার, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, বহুবিবাহ, তালাক, বিবাহ বিচ্ছেদ, দেনমোহর, স্ত্রীর ভরণপোষণ প্রভৃতি বিষয়ে বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উত্তরাধিকার আইনে কারো দাদার পূর্বে পিতা মৃত্যু বরণ করলেও সে তার দাদার সম্পত্তির অংশ পাবে মর্মে বিধান করা হয়।

৪. মৌলিক গণতন্ত্র

'মৌলিক গণতন্ত্র' ব্যবস্থাটি আইয়ুব খানের অভিনব উদ্ভাবন। এটি ছিল চারস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। ১৯৫৯ সালে জারিকৃত মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ এর উদ্দেশ্য ছিল জনগণের ইচ্ছেকে সরকারের কাছাকাছি এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরকে জনগণের কাছাকাছি এনে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ-এর ব্যবস্থা করা। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের চারটি স্তর ছিল: (১) ইউনিয়ন কাউন্সিল (গ্রাম এলাকায়) এবং টাউন কমিটি (শহর এলাকায়), (২) থানা কাউন্সিল (পূর্ব পাকিস্তানে) এবং তহশিল কাউন্সিল (পশ্চিম পাকিস্তানে), (৩) জেলা কাউন্সিল এবং (৪) বিভাগীয় কাউন্সিল।

ইউনিয়ন কাউন্সিল

এই ৪টি স্তরের মধ্যে ইউনিয়ন কাউন্সিল স্তরটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইউনিয়নের প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারের প্রত্যক্ষ ভোটে ইউনিয়ন কাউন্সিলের ১০ জন সদস্য নির্বাচিত হতেন। বারশ থেকে পনেরশ ভোটদাতার প্রতিনিধি হিসেবে একজন সদস্য নির্বাচিত হতেন। এভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ 'মৌলিক গণতন্ত্রী' বা Basic Democracy Member বা সংক্ষেপে বিডি মেম্বার নামে অভিহিত হন। উভয় প্রদেশ থেকে ৪০,০০০ করে পাকিস্তানে মোট ৮০,০০০ বিডি মেম্বারের সংখ্যা নির্ধারিত হয়। এসব মেম্বারগণ ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ও দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের Electoral College বা ভোটারে পরিণত হন। এটিই হচ্ছে মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থার অভিনব বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পিছনে আইয়ুব খানের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল পর্যায়ে তাঁর সমর্থক গোষ্ঠি সৃষ্টি করা। এই ব্যবস্থায় মৌলিক গণতন্ত্রীগণ আইয়ুব খানের সে উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। এই ব্যবস্থায় মৌলিক গণতন্ত্রীগণ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, এমপি, এমএনএ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটাধিকার লাভ করায় রাজনীতিতে জনগণের ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়। ফলে এই ব্যবস্থা জনগণের কাছে অপ্রিয় ও অগ্রহণযোগ্য হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশে ইউনিয়ন কাউন্সিলের হাতে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পন করা হয়। গ্রাম পুলিশের সহায়তায় ইউনিয়নের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ছোটখাট ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার নিস্পত্তি করার দায়িত্ব ইউনিয়ন কাউন্সিলের উপর অর্পিত হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য জনসাধারণের উপর বিভিন্ন ট্যাক্স আরোপ ও তা আদায়ের ক্ষমতা ইউনিয়ন কাউন্সিলকে দেয়া হয়।

থানা, জেলা ও বিভাগীয় কাউন্সিল

থানা কাউন্সিল: থানার অর্ন্তগত ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও সমসংখ্যক থানা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে থানা কাউন্সিল গঠিত হয়। থানার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোর কাজের সমন্বয় করাই ছিল থানা কাউন্সিলের কাজ। মহকুমা প্রশাসক কিংবা তাঁর অনুপস্থিতিতে সার্কেল অফিসার থানা কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করতেন।

জেলা কাউন্সিলঃ জেলা পর্যায়ের ২০ জন সরকারি কর্মকর্তা, ১০ জন বেসরকারি সদস্য ও জেলার অন্তর্গত ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে ১০ জনসহ মোট ৪০ জন সদস্য সমন্বয়ে জেলা কাউন্সিল গঠিত হতো। ডেপুটি কমিশনার জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, রাস্তাঘাট, কালভার্ট, ব্রিজ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রভৃতি ছিল জেলা কাউন্সিলের কাজ।

বিভাগীয় কাউন্সিলঃ বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন। বিভাগের অর্ন্তগত বিভিন্ন জেলা কাউন্সিলের মধ্যে সমন্বয় সাধনই ছিল বিভাগীয় কাউন্সিলের অন্যতম কাজ। বিভাগীয় কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। বিভাগের অন্তর্গত জেলা কাউন্সিলগুলির চেয়ারম্যান, বিভিন্ন উন্নয়ন দফতরের প্রতিনিধিবর্গ ও কিছু ইউপি চেয়ারম্যান সমন্বয়ে বিভাগীয় কাউন্সিল গঠিত হতো।

আইয়ুবের অধীনে বিভিন্ন নির্বাচন

'মৌলিক গণতন্ত্রী আদেশ ১৯৫৯'-এর আওতায় সারাদেশে প্রথম মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১১.০১.১৯৬০ তারিখে। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে ১৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৬০) গোপন ব্যালটে হ্যাঁ-না ভোটের মাধ্যমে আইয়ুব খান ৫ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সংবিধান প্রণয়ন

১৯৫৬ সালে প্রণিত সংবিধান ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির সময় বাতিল করা হয়। আইয়ুব খান দেশ পরিচালনা করছিলেন সামরিক আইনের মাধ্যমে। পাকিস্তানে একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান ১৭.০২.১৯৬০ তারিখে একটি ১১ সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান প্রণয়ন কমিশন গঠন করেন। দেশে তখন সামরিক আইন চালু থাকায় জনগণের বাক-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। এতদসত্ত্বেও কমিশন প্রশ্নমালা পূরণের মাধ্যমে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে সাক্ষাতকার প্রদানকারীগণ ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন এবং সংবিধানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি করেন। কমিশন ১৯৬১ সালের ৬ মে একটি রিপোর্ট প্রেসিডেন্টের নিকট উপস্থাপন করেন। কিন্তু রিপোর্টটি প্রেসিডেন্টের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি তা গ্রহণ করেননি। এরপর প্রেসিডেন্ট ৩১.১০.৬১ তারিখে একটি নতুন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি 'জনগণ কী চায়' তা প্রাধান্য না দিয়ে 'প্রেসিডেন্ট কী চান' - এই নীতির ভিত্তিতে সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ১ মার্চ তা 'অনুমোদন করেন এবং তা' কার্যকরি করা হয় ১৯৬২ সালের ৮ জুন।

১৯৬২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১. **দীর্ঘ এবং লিখিত দলিলঃ** ১৯৬২ সালের সংবিধান একটি দীর্ঘ এবং বিস্তারিত লিখিত দলিল।

২. **প্রস্তাবনাঃ** সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয় যে, সমগ্র বিশ্বের মালিক আল্লাহ। ইসলামে বর্ণিত সাম্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সহনশীলতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রভৃতি পাকিস্তানে অনুসরণ করা হবে।

৩. **মৌলিক অধিকারঃ** ১৯৬২ সালের মূল সংবিধানে মৌলিক অধিকারের কোনো উল্লেখ ছিল না। কিন্তু ১৯৬৪ সালে সংবিধান সংশোধন করে তাতে সীমিত মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: আইনের চোখে সকল নাগরিক সমান, পাকিস্তানের যে কোনো নাগরিক দেশের যে কোনো স্থানে সম্পত্তি অর্জন কিংবা বিক্রয় করতে পারবে।

৪. **প্রেসিডেন্সিয়াল বা রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতিঃ** ১৯৬২ সালের সংবিধান দেশে প্রেসিডেন্সিয়াল সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করে। প্রেসিডেন্ট মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। ৩৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক মুসলমান ধর্মাবলম্বী এবং জাতীয় সংসদে সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য হবে।

এই সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে অতিমাত্রায় নির্বাহী ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে। তিনি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে জরুরি আইন ঘোষণা, জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডাকা, স্থগিত রাখা কিংবা জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়ার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। জাতীয় সংসদে পাস করা বিলে তিনি ভেটো দিতে পারতেন। তিনি প্রদেশের গভর্নর ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নিয়োগ করতেন। প্রেসিডেন্টের অনুমোদনক্রমে গভর্নর প্রদেশের মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত

করতেন। অন্যান্য সকল বড় বড় পদে, যেমন প্রধান সামরিক কর্মকর্তা, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি, নির্বাচন কমিশনার, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগদানের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে ছিল।

জাতীয় সংসদের অধিবেশন না চলাকালীন সময়ে প্রেসিডেন্ট ছয় মাস মেয়াদের জন্য যেকোন অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারতেন। পাকিস্তানের নিরাপত্তার স্বার্থে ও দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার্থে দেশের যেকোন নাগরিককে তিনি আটক রাখার হুকুম দিতে পারতেন।

৫. **এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদঃ** ১৯৬২ সালের সংবিধান এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করে। জাতীয় পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫৬ জন (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৭৫ জন করে। ৬টি মহিলা আসন সংরক্ষিত ছিল।) প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫০ এবং সংরক্ষিত মহিলা আসন ৫টি। মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতেন। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কোনো ক্ষমতা ছিল না।

৬. **যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রের সঙ্গে প্রদেশের সম্পর্কঃ** পাকিস্তানকে ফেডারেল রাষ্ট্র বানানোর কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। প্রদেশের হাতে খুব কম বিষয়ই ছিল যার ওপর প্রদেশের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ছিল। নিরাপত্তার নামে প্রদেশ সংক্রান্ত যে কোন আইন পাশের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। প্রদেশের গভর্নরের নিয়োগ ও মেয়াদকাল প্রেসিডেন্টের হাতে থাকায় গভর্নরগণ প্রেসিডেন্টের বশংবদে পরিণত হন। সংবিধানটি বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস করে।

৭. **অন্যান্যঃ** এই সংবিধান দুস্পরিবর্তনীয় ছিল। সংবিধানে বাংলা ও উর্দু উভয়কেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হয়।

সামরিক শাসন ও আইয়ুবীয় স্বৈরাচার

আইয়ুব খানের সামরিক শাসন কেন্দ্রে ও প্রদেশ দুটিতে গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় শাসনব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে। তাঁর সামরিক শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রীকরণ। তিনি নিজের হাতে সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। প্রাদেশিক সরকারের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সামরিক শাসনামলে রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকে। দুর্নীতি দমনের নামে অনেক জনপ্রিয় ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতার উপর উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্রকে নির্বাসন দেওয়া হয়। তিনি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানেন। রোমান হরফে বাংলা বর্ণমালা প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়। নজরুলের কবিতাকে ইসলামীকরণের নামে কবিতার অনেক শব্দ পরিবর্তন করা হয়।

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে ৪৪ মাসে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো আন্দোলন সংঘটিত হয়নি। কোনোরূপ বক্তব্য বিবৃতিও উচ্চারিত হয়নি। আইয়ুব খান কর্তৃক সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হলে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো:

(ক) সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতারের প্রতিবাদঃ ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হলে তার প্রতিবাদে ১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬২) ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয়। ধর্মঘট ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমান, ইত্তেফাকের সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া প্রমুখ রাজনীতিবিদ ও অনেক ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এইভাবে ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে সামরিক শাসন বিরোধী প্রকাশ্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

(খ) সংবিধান বিরোধী আন্দোলনঃ ১৯৬২ সালের ১ মার্চ সংবিধান ঘোষণা করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ, সমাবেশ এবং ক্লাশ বর্জন শুরু করে। সরকারও দমন পীড়ন নীতি অবলম্বন করে। বহুসংখ্যক ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। সরকার ২৮ এপ্রিল (১৯৬২) জাতীয় পরিষদের এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করার পর ৮ জুন (১৯৬২) সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদেরকে মুক্তি দেয়া হয়।

(গ) শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন (সেপ্টেম্বর, ১৯৬২): আইয়ুব খান শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। তদানীন্তন শিক্ষা সচিব এস.এম.শরীফকে সভাপতি করে গঠিত এগার সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশন 'শরিফ কমিশন' নামে অভিহিত। কমিশন ১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট তার সুপারিশ পেশ করে। কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ:

– তিন বছরের বি.এ কোর্স পদ্ধতি চালু করা (এর আগে ছিল দু'বছরের বি.এ পাস কোর্স)।
– স্কুল-কলেজের সংখ্যা সীমিত রাখা।
– শিক্ষা ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ অভিভাবককে বহন করতে হবে।
– ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা হবে।

কমিশনের এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়। ঢাকা কলেজে সর্বপ্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ঐ কলেজের ছাত্ররা 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এই সংগঠনের নামে ঢাকা শহরের অন্যান্য কলেজের ছাত্ররা আন্দোলন পরিচালনা করে। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আন্দোলনে যোগ দেয়। তখন সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে করা হয় 'ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম'। এক পর্যায়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ নেতৃত্বের হাতে চলে যায়। ১৭ সেপ্টেম্বর হরতাল আহ্বান করা হয়। হরতালের দিন ছাত্র জনতা মিলিতভাবে রাস্তায় নেমে পড়ে। মিছিলে গুলিবর্ষণ করা হলে বাবুল, বাসকন্টাক্টর গোলাম মোস্তফা ও গৃহভৃত্য ওয়াজিউল্লাহ নিহত হয়। আহত হয় প্রায় আড়াইশ জন। ২৩ সেপ্টেম্বর ১ জন ছাত্র নিহত হয়। ফলে আন্দোলন ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তখন রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনে অংশ নেননি। ছাত্রদের আন্দোলনের ফলেই সরকার শরীফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত করে। এই আন্দোলনের তাৎপর্য এই যে, পরবর্তীকালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররাই প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়।

আইয়ুব খানের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯৬২ সালের ৮ জুন পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান কার্যকর করা হয়। ঐদিন সামরিক আইন তুলে নেয়া হয়। এর ফলে রাজনীতিবিদগণ ও ছাত্র সংগঠনগুলো প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ পায়। রাজনীতিবিদগণ প্রথমেই যে দাবিনামা উত্থাপন করে তা হলো সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়া, দলীয় রাজনীতি শুরু করা ইত্যাদি।

সংবিধান কার্যকর হওয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৬০ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য (৭৮ জনের মধ্যে) সরকারের নিকট দাবি করে যে, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, বিচার বিভাগ কর্তৃক নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা, রাজবন্দিদের মুক্তি, রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি প্রদান, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

পার্লামেন্টের বাইরে নয় জন রাজনৈতিক নেতা এক যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে আইয়ুবের সংবিধানকে অবৈধ ঘোষণা করেন এবং জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ নির্বাচনের দাবি করেন।

এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ৩০ জুন (১৯৬২) 'রাজনৈতিক দল আইন' শীর্ষক একটি বিল জাতীয় পরিষদে উত্থাপন করেন। বিলটি ১৪ জুলাই (১৯৬২) জাতীয় পরিষদে পাশ হয়। ফলে রাজনৈতিক দলগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এসময় জামায়াতে ইসলামী ও নেজামী এসলামীর কর্মকান্ড শুরু হয়। মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা জেলে থাকায় এবং এবডো আইনের আওতায় পড়ায় এসব দলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হয়। আইয়ুব খানের চক্রান্তে মুসলিম লীগ বিভক্ত হয়। তার অনুসারীদের নিয়ে গঠিত হয় কনভেনশন মুসলিম লীগ (৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩)। আইয়ুব বিরোধীরা গঠন করেন কাউন্সিল মুসলিম লীগ। আইয়ুব খান ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কনভেশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করেন। কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন খাজা নাজিমউদ্দিন। এসময় আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি আওয়ামী লীগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বদলে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে একটি জোট গঠন করেন (৪ অক্টোবর, ১৯৬২)। জোটের নাম দেন ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট (সংক্ষেপে

এন.ডি.এফ.)। সোহরাওয়ার্দি জীবিত থাকাকালীন আওয়ামীলীগ পুনরুজ্জীবিত হয়নি। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর তার মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ আত্মপ্রকাশ করে। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন (তিনি ১৯৫৩ সাল থেকেই দলটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন)। ইতোপূর্বে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে ৩১ আগস্ট (১৯৬৩) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে আইয়ুব বিরোধী মঞ্চে সমবেত হওয়ার লক্ষ্যে গঠন করা হয় 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (Combined Opposition Party বা COP)।

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ ৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটার ছিলেন সমগ্র পাকিস্তানে ৮০,০০০ (আশি হাজার) মৌলিক গণতন্ত্রী। ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন আয়োজন করা হয়। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে গঠিত হয় 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (COP)।

আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী মনোনীত করা হয় মিস ফাতিমা জিন্নাহকে। তিনি ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভগ্নি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন এবং পাকিস্তান ছাত্রশক্তি নামক তিনটি ছাত্রসংগঠন মিলে 'পূর্ব পাকিস্তান সংগ্রামী ছাত্র সমাজ' নামক একটি ছাত্র ঐক্য গঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ) ৯ দফা নির্বাচনী মেনিফেস্টো ঘোষণা করে, যেমন–

১. একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করা হবে,
২. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন করা হবে,
৩. জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদকে আইন ও বাজেট প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হবে,
৪. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে,
৫. প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হ্রাস করা হবে,
৬. শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা হবে,
৭. আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টকে প্রদান করা হবে,
৮. সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেয়া হবে, এবং
৯. নিবর্তনমূলক সকল আইন বিলুপ্ত করা হবে।

নির্বাচনী ফলাফল

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মিস ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেলেও মৌলিক গণতন্ত্রীগণ ভোট দেন আইয়ুব খানকে। আইয়ুব খান পশ্চিম পাকিস্তানে ৭৩.৭% এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৫৩.১% ভোট লাভ করেন। নির্বাচনে স্বল্প সংখ্যক মৌলিক গণতন্ত্রীকে আইয়ুব খানের পক্ষে বশীভূত করা সহজ হয়। সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ আইয়ুব খানের পক্ষে মৌলিক গণতন্ত্রীদের মধ্যে কাজ করেন।

অন্যান্য নির্বাচন

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ২১ মার্চ (১৯৬৫) জাতীয় পরিষদের এবং ১৬ মে (১৯৬৫) প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মৌলিক গণতন্ত্রীগণ এই নির্বাচনের ভোটার ছিলেন। স্বভাবতঃই আসন প্রতি ভোটার সংখ্যা সামান্য ছিল। জাতীয় পরিষদের প্রতি আসনে ৫৫০ জন (৩টি থানা এলাকা) এবং প্রাদেশিক পরিষদে ২৭৫ জন (গড়ে ২টি থানা এলাকা)। এ নির্বাচনেও মৌলিক গণতন্ত্রীদেরকে বশীভূত করা হয়। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে কনভেনশন মুসলিম লীগ ১১৫, কপ ৯, এনডিএফ ৪ অন্যান্য ৪ এবং স্বতন্ত্র সদস্য ১৮টি আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে কনভেনশন মুসলিম লীগ ১৫৫টি আসনের মধ্যে ৬৬, কপ ২৫, অন্যান্য ৬ এবং স্বতন্ত্র সদস্যগণ ৫৮টি আসন পান। স্বতন্ত্র সদস্যগণ পরে অধিকাংশই সরকারি দলে যোগদান করেন।

নির্বাচনী ফলাফলের প্রতিক্রিয়া

প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনী ফল এটাই প্রমাণ করে যে, জনসমর্থন বিরোধিদলের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থায় সরকারি দলের প্রার্থীকে পরাজিত করা কঠিন। এ ব্যবস্থায় দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অর্জন সম্ভব নয়। স্বভাবত মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ গ্রহণ করতে পারেনি।

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ ও পূর্ব পাকিস্তানে তার প্রভাব

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান -ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭ দিন ব্যাপী যুদ্ধ চলে পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি পাশ হয় ২০ সেপ্টেম্বর। যুদ্ধ বন্ধ হয় ২৩ সেপ্টেম্বর (১৯৬৫)। এই যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। তখন পূর্ব পাকিস্তানের কোন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। এই যুদ্ধে প্রমাণিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিল না। এই অবস্থা পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে আরও জোরদার করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	• সামরিক শাসনের কুফলসমূহ পর্যালোচনা করে একটি এ্যাসাইনমেন্ট লিখুন। • '১৯৬২ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন' শিরোনামে আরেকটি এ্যাসাইনমেন্ট লিখে টিউটরকে দেখাবেন।

সারসংক্ষেপ

- ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি ছিল।
- সামরিক শাসক আইয়ুব খান বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তারমধ্যে মৌলিক গণতন্ত্র বাঙালিদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে।
- ১৯৬২ সাল থেকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কত সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়? (জ্ঞানমূলক)
ক) ৫ অক্টোবর ১৯৫৮ খ) ৬ অক্টোবর ১৯৫৮
গ) ৭ অক্টোবর ১৯৫৮ ঘ) ৮ অক্টোবর ১৯৬৮

২। আইয়ুব খান কত সালে মৌলিক গণতন্ত্র চালু করেন–
ক) ১৯৫৯ খ) ১৯৬০
গ) ১৯৬২ ঘ) ১৯৬৩

৩। সিরাজ সাহেব ছেলে রাশেদকে মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানিয়েছিলেন। বাবা পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্রীদের সংখ্যা কত বলেছিলেন?
ক) চল্লিশ হাজার খ) ষাট হাজার
গ) আশি হাজার ঘ) এক লাখ

৪। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রণীত মৌলিক গণতন্ত্রীদের হাতে প্রদান করা হয় (অনুধাবন)
i) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার ক্ষমতা

ii) জাতীয় আইনসভার সদস্যদের নির্বাচনের ক্ষমতা
iii) প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের নির্বাচনের ক্ষমতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। আইয়ুব খানের শাসন ক্ষমতা গ্রহনের ফলে দেশে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়?

ক) বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় খ) সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়
গ) গণতন্ত্র ধ্বংস ও এক ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা হয় ঘ) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু হয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

পূর্ব পাকিস্তানে চল্লিশ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে চল্লিশ হাজার মোট আশি হাজার প্রতিনিধি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। এদের হাতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের নির্বাচন করার এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল পরিচালনা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

৬। উল্লিখিত ব্যবস্থাকে কি নামে অভিহিত করা হয়? (প্রয়োগমূলক)

ক) পরিচালনা কমিটি খ) নির্বাচক মন্ডলী
গ) প্রকৃত গণতন্ত্র ঘ) মৌলিক গণতন্ত্র

৭। জনগণ উক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়– কারণ (উচ্চতর দক্ষতা)

i) জনগন আইনসভার সদস্য নির্বাচনের অধিকার হারায়
ii) মৌলিক গণতন্ত্রীদের অত্যাচার বেড়ে যায়
iii) মৌলিক গণতন্ত্রীরা আইয়ুব সরকারের পতন ঘটায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব মেহবুব একটি দেশের প্রেসিডেন্ট। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালিন সংবিধান বাতিল করেন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেন। এছাড়া রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। একসময় তার সামরিক আইন প্রশাসক তাকে অপসারন করে নিজে প্রেসিডেন্ট হন এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকারে রেখে দেশে এক ধরনের গণতন্ত্র কয়েম করেন।

ক. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কখন রচিত হয়।
খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে যে সামরিক শাসকের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে পাঠ্য পুস্তকের আলোকে তার কর্মকান্ড উল্লেখ করুন।
ঘ. আপনি কি মনে করেন উদ্দীপকের সমরিক আইন প্রশাসকের (পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট) প্রবর্তিত ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানে কুফল বয়ে এনেছিল? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ-১৩.৪ ছয়দফা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ছয়দফা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ছয়দফা দাবিসমূহ সম্পর্কে বিবিরণ দিতে পারবেন;
- ছয়দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ছয়দফা, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, মুক্তিসনদ, ছয়দফার গুরুত্ব, স্বাধীনতার বীজ।

ভূমিকা

১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলসমূহের নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশনে শেখ মুজিবুর রহমান যে ছয়দফা দাবিনামা উত্থাপন করেছিলেন তা আদায়ের জন্য তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল ইতিহাসে তা 'ঐতিহাসিক ছয়দফা আন্দোলন' নামে অভিহিত হয়ে আছে। শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ছয়দফা দাবি উত্থাপনের পেছনে দীর্ঘ পটভূমি ছিল। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

পটভূমি

পাকিস্তানের এতো বহুভাষা ভাষী এবং ভিন্ন সংস্কৃতির অধিবাসী ও ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুদৃঢ় করতে হলে তাদের মধ্যে 'একজাতি একরাষ্ট্র' - এই চেতনাবোধ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। তা সম্ভব ছিল পাকিস্তানের দুই অংশের নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক মমত্ববোধ ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে একের সমস্যা অন্যের অনুধাবন করার মানসিকতা অর্জনের মাধ্যমে। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রের যাত্রা লগ্নেই সূচনা ঘটে এক অংশের প্রতি অন্য অংশের অবিশ্বাস ও সন্দেহের।

বাঙালিদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়ার সঙ্গত কারণ ছিল। স্বাধীনতার পরপরই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলাভাষার প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয় তাতে পূর্ববাংলা প্রদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন ধারণা জন্মলাভ করে যে তাদের কখনই রাষ্ট্রীয় সমানাধিকার দেওয়া হবে না। প্রথমে ভাষার প্রশ্নে বাঙালি অধিকার সচেতন হয়। ক্রমান্বয়ে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যগুলি তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। সেসব বৈষম্য পর্যালোচনা করলে আমরা ছয়দফা দাবির আন্দোলনের যৌক্তিকতা বুঝতে পারব। নিম্নে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্য সৃষ্ট বৈষম্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'লো–

(ক) রাজধানী নির্মাণজনিত কারণে সৃষ্ট বৈষম্য

পাকিস্তান জন্মলাভের পর তার রাজধানী করা হয় করাচিতে। এরপর আইয়ুব খান প্রথমে রাওয়ালপিন্ডিতে (১৯৬১) এবং পরে ইসলামাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন। করাচিকে রাজধানী শহর হিসেবে গড়ে তুলতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ব্যয় করা হয় ৫৭০০ মিলিয়ন টাকা (পাকিস্তান সরকারের মোট ব্যয়ের ৫৬ শতাংশ)। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি ব্যয় ছিল

দেশের মোট ব্যয়ের মাত্র ৫ শতাংশ। আইয়ুব খান ইসলামাবাদের উন্নয়নে ১৯৬৭ সালে যেখানে বরাদ্দ দেন ৩০০০ মিলিয়ন টাকা, সেখানে ঢাকার উন্নয়নে বরাদ্দ দেন মাত্র ২৫০ মিলিয়ন টাকা। এভাবে রাজধানী শহরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশাল বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়।

(খ) অর্থনৈতিক বৈষম্য

আইয়ুব খানের শাসনামলে দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য কমানোর পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচারের হার বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল পাট রফতানি। পাট রফতানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো তা ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে। ১৯৪৭-৬৬ সময়কালে পাকিস্তানের মোট রফতানিতে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ ছিল ৪২ ভাগ, অথচ মোট আমদানিতে তার অংশ ছিল ৬৯ ভাগ। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রফতানি খাতে অবদান ৫৮ ভাগ হলেও সেখানে আমদানি হয় মাত্র ৩১ ভাগ।

ব্যাংকিং সেক্টরেও পূর্ব পাকিস্তান অবহেলিত ছিল। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানে তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ৩৬ টি, যার মোট ১১৩০টি শাখার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে শাখা ছিল মাত্র ৩৬২টি (৩২%)। স্বভাবতই ব্যাংকিং সেক্টরের মাধ্যমে যে বিনিয়োগ করা হয় তার সিংহভাগ পায় পশ্চিম পাকিস্তান।

(গ) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই সরকারি নিয়োগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বাড়তে থাকে। করাচিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করায় সেখানকার বিভিন্ন অফিস-আদালতে সৃষ্ট নতুন ছোট বড় পদে পশ্চিম পাকিস্তানীরাই একচেটিয়া চাকুরি লাভ করে। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। সামরিক শাসনের ৪৪ মাসে ৭৯০ জন জুনিয়ার গ্রেড কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল মাত্র ১২০ জন (১৫%)। ১৯৬৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী গেজেটেড কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩৩৮ এবং ৩৭০৮ জন। একই বছর নন-গেজেটেড কর্মচারী সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানী ২৬,৩১০ জন এর পশ্চিম পাকিস্তানী ৮২,৯৪৪ জন। তাছাড়া ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত, অর্থ ও সংস্থাপন সচিব, অর্থমন্ত্রী, স্টেট ব্যাংকের গভর্নর কখনই পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিযুক্ত হননি। ক্যাডার সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানীদের হার ছিল নিম্নরূপ: সচিব ১৪%, যুগ্মসচিব ৬%, উপ-সচিব ১৮%, সহকারি সচিব ২০% (মোট ৭৪১ জনের মধ্যে মাত্র ৫১ জন)।

ফরেন সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা সার্ভিসেও ব্যাপক বৈষম্য ছিল। ফরেন সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানী কর্মকর্তা-কর্মচারীর হার ছিল ১৯৬২ সালে ২১%। প্রতিরক্ষা সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানের অংশগ্রহণ সেনাবাহিনীতে ১.৫৬%, নৌবাহিনীতে ১.১৬%, বিমান বাহিনীতে ৮.৫৭% (১৯৫৬)।

(ঘ) শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

১৯৪৭ সালে প্রাইমারি থেকে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বেশি ছিল। কিন্তু পরবর্তী ২০ বছর পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষা বাবদ অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও বৈষম্য বাড়তে থাকে। ১৯৫১-১৯৬১ সময়কালে শিক্ষাখাতে পূর্বপাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু বার্ষিক বরাদ্দ ছিল ৫.৬৩ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য তা ৮.৬৩ টাকা।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উপেক্ষার নীতি ও ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ পরবর্তী বাঙালির ক্ষোভ

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থা যে কতটা দুর্বল ছিল তা এই যুদ্ধের সময় স্পষ্ট হয়ে যায়। যুদ্ধের সতেরো দিন প্রশাসনিক দিক দিয়েও এই প্রদেশ কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি, যা দেশভাগের সময় থেকেই উচ্চারিত হচ্ছিল, পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর আরো তা জোরদার হয়। স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে আওয়ামী লীগ।

শেখ মুজিব কর্তৃক ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর পরই স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তাদের অন্যতম শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায় অতি আবশ্যক হয়ে পড়েছে। শুধু ঘোষণা দিয়েই মুজিব ক্ষান্ত হননি, তিনি স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছয়দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধিদলসমূহের নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশনে, যা আইয়ুব খান কর্তৃক তাসখন্ড চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধিতা করার জন্য

আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে (৬.৬.১৯৬৬ তারিখে) শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। কনভেনশনটি মূলত পাকিস্তানের ডানপন্থী দলসমূহ নিয়ে গঠিত ছিল। কনভেনশনে উপস্থিত ৭৪০ জন প্রতিনিধির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ছিলেন মাত্র ২১ জন। উক্ত ২১ জনের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলের ৪ জন নেতা। এই কনভেনশনে শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করলে উপস্থিত ৭৩৫ জন প্রতিনিধি তা তাৎক্ষণিকভাবে নাকচ করে দেন। এর প্রতিবাদে শেখ মুজিব তার ছোট প্রতিনিধিদল নিয়ে সম্মেলন স্থল ত্যাগ করেন এবং ঢাকা ফিরে আসেন। ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সংবাদপত্রে এবিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাপা হয়। এ দাবিগুলি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা অবহিত ছিলনা। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তা পেশ করা হয়নি। ফলে কিছু প্রবীণ নেতা ক্ষুব্ধ হন। তবে আওয়ামী লীগের তরুণ নেতৃবৃন্দ ছয়দফা কর্মসূচি সমর্থন করেন। প্রবীণ নেতাদের আপত্তি বা গড়িমসি সত্ত্বেও তরুণ কর্মীরা 'বাঙালির দাবি ৬ দফা', 'বাঁচার দাবি ৬ দফা', '৬ দফার ভিতরেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন নিহিত' ইত্যাদি শ্লোগান সংবলিত পোস্টারে পোস্টারে দেয়াল ছেয়ে ফেলেন। ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদনের পূর্বেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা-কর্মসূচি' শীর্ষক এক পুস্তিকা বিলি করা হয়।

১৩ মার্চ (১৯৬৬) আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয়দফা কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। কাউন্সিল অধিবেশনেও (১৮-১৯ মার্চ ১৯৬৬) তা অনুমোদিত হয়। কাউন্সিল অধিবেশনে নতুন কমিটি গঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি এবং তাজউদ্দিন আহমেদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ছয়দফার বিবরণ

এক. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করত পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্ট পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

দুই. ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

তিন. এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়। এর যে কোনো একটি গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয়:

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিয়োগযোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তনে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

চার. সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

পাঁচ. এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয়:

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি রফতানি চলিবে।

৫. ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

ছয়. এই দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হয়।

১৩ মার্চ ১৯৬৬ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয়দফা কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। মওলানা তর্কবাগীশ এবং আরো কিছু প্রবীণ নেতা ছয়দফার বিরোধিতা করেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদিত হলেও তা পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কাউন্সিল অধিবেশন বসে ১৮ ও ১৯ মার্চ ১৯৬৬। পার্টির সভাপতি মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ৬ দফার বিরোধিতা করে সভাস্থল ত্যাগ করলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সভার কাজ চালিয়ে যান। এই সভায় ছয়দফা কর্মসূচি অনুমোদিত হয়। তাছাড়া নতুন ওয়ার্কিং কমিটিও গঠিত হয়।

ছয়দফার আন্দোলন ও সরকারের নির্যাতন

ছয়দফা দাবি কী ও কেন এ বিষয়টি জনগণকে বোঝানোর জন্য শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সারাদেশ জুড়ে ছয়দফার প্রচারণা শুরু করেন। শেখ মুজিব ২০ মার্চ থেকে ৮ মের মধ্যে ৫০ দিনে ৩২টি জনসভায় ভাষণ দেন। এই অল্পসময়ের মধ্যে তিনি ৬ দফার পক্ষে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি করেন। শেখ মুজিব ছাত্রলীগকেও ছয়দফার প্রচারণায় সংশ্লিষ্ট করেছিলেন। ছয়দফা কর্মসূচি জনপ্রিয় হতে থাকলে আইয়ুব-মোনেম চক্র আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। শেখ মুজিব যেন জনসভা করতে না পারেন সেজন্য যেখানেই তিনি জনসভা করতে যান সেখানেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। আবার জামিনও দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ৮ মে (১৯৬৬) তাকে দেশ রক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়। দলের প্রায় ৩৫০০ নেতা-কর্মীকেও গ্রেফতার করা হয়।

শেখ মুজিব ও দলের নেতা কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ১৯৬৬ সালের ৭ জুন গোটা প্রদেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ৭ জুনের হরতালে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকরা জড়িয়ে পড়ে।

৭ জুন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও তেজগাঁয় পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত ও অগণিত মানুষ আহত হন। তাছাড়া দেড় হাজার ব্যক্তিকে কারাগারে আটক করা হয়।

ছয়দফার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য সরকার ১৯৬৬ সালের ১৩ জুনের মধ্যে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় স্তরের নেতাদেরকে গ্রেফতার করে। এভাবে সেপ্টেম্বরের মধ্যে (১৯৬৬) আওয়ামী লীগের ৯৩৩০ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ১৬ জুন ইত্তেফাক নিষিদ্ধ এবং নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ছয়দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। ছয়দফার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের পর্যায় শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি যে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করে তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় ছয় দফা দাবি ঘোষণার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা দাবিকে 'বাঙালির বাচাঁর দাবি' হিসেবে উল্লেখ করেন। ছয়দফার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব অর্থনৈতিক সম্পদ, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় ও বৈদেশিক আয়ের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দাবি করা হয়। সর্বোপরি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষমতাও দাবি করা হয়।

ছয়দফা দাবিকে বাঙালির 'মুক্তিসনদ' বলা হয়। ছয়দফা আন্দোলনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়। ইতোপূর্বে ভাষার দাবিতে হয় ভাষা আন্দোলন, ছাত্রদের দাবি ভিত্তিক হয় শিক্ষা আন্দোলন, কিন্তু ছয়দফার আন্দোলন ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন। পূর্বের আন্দোলনগুলিতে ছাত্ররাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ছয়দফার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সংগঠন আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধু এ আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে দেন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জাতীয় নেতায় পরিণত হন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সরকার জেল-জুলুম ও নির্যাতনের মাধ্যমে ছয় দফার আন্দোলনকে স্তিমিত করতে পারলেও ছয়দফার দাবিগুলিকে বাঙালির মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় ঘোষিত ১১ দফা

দাবির মধ্যে ৬ দফা দাবিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে নির্বাচনী মেনিফেস্টো প্রচার করে তাতে ছয়দফা দাবিগুলি সন্নিবেশিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু ছয়দফাকে নির্বাচনী ম্যান্ডেট হিসেবে ঘোষণা করেন। ছয়দফা ও এগার দফার আন্দোলনের সময় বাঙালির মধ্যে যে সচেতনতা ও ঐক্য গড়ে ওঠে তার ফল পাওয়া যায় সত্তরের নির্বাচনে। এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানবাসী আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়ী করে। নির্বাচনের মাধ্যমে ছয়দফার প্রতি জনগণের রায় পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তা অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে শাসন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। ফলে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়। তাই বলা যায় যে, ছয় দফা আন্দোলনে স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	'ছয়দফার আন্দোলনে স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল'– শিরোনামে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিন।

সারসংক্ষেপ

- শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলের সম্মেলনে ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি ছয়দফা ভিত্তিক আন্দোলনও গড়ে তোলেন।
- ছয়দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।
- ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় ঘোষিত ১১ দফা দাবির মধ্যে ৬ দফা দাবিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ছয়দফাকে নির্বাচনী ম্যান্ডেট হিসেবে ঘোষণা করেন।
- ছয়দফার আন্দোলনে স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শেখ মুজিবর রহমান কোথায় ৬ দফা কর্মসূচি পেশ করেন? (জ্ঞানমূলক)

ক) করাচিতে খ) চট্টগ্রামে

গ) লাহোরে ঘ) ঢাকায়

২। ৬ দফাকে বলা হয় বাঙালির (অনুধাবন)

i) জাতীয় দাবী ii) প্রাণের দাবী iii) আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। শিক্ষক ছাত্রদেরকে বাঙালি জাতির ম্যাগনাকার্টা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে নীচের কোনটির উল্লেখ করেন? (প্রয়োগমূলক)

ক) ৪ দফা খ) ৬ দফা

গ) ১১ দফা ঘ) ২১ দফা

৪। ভাষা আন্দোলনে জন্ম নেওয়া চেতনা বোধকে ত্বরান্বিত করেছিল কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক) আইয়ুব খানের ক্ষমতা লাভ খ) পাকিস্তানীদের বৈষম্য নীতি

গ) পাক ভারত যুদ্ধ ঘ) ৬ দফা দাবি

পাঠ-১৩.৫ আগরতলা মামলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আগরতলা মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আগরতলা মামলার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আগরতলা মামলার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আগরতলা মামলা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তা, ট্রাইবুনাল, হাইকোর্টে রিট, সার্জেন্ট জহুরুল হক হত্যাকান্ড, শেখ মুজিবুর রহমান।

ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আগরতলা মামলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করে যে, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটি ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়েছে। এর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা, সিভিল সার্ভিসের দুইজন বাঙালি কর্মকর্তাসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ১৮ জানুয়ারি আরেকটি প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে উক্ত মামলার ১নং আসামী বলে ঘোষণা করা হয়। এই মামলার বিচারের জন্য একটি স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠিত হয়। এই মামলার সরকারি নাম 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। লোকমুখে এই মামলা পরিচিতি লাভ করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে। বঙ্গবন্ধু এই মামলার নামকরণ করেছিলেন 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা' নামে। প্রকৃতপক্ষে কোনো ষড়যন্ত্র হয়ে থাকলেও তা ছিল বাংলাদেশের মুক্তির জন্য এক প্রচেষ্টা, তাই এটি ষড়যন্ত্র হতে পারে না। সেজন্য আমরা একে উল্লেখ করেছি শধু 'আগরতলা মামলা' নামে।

মামলার বিষয়বস্তু

এই মামলায় পাকিস্তান সরকার অভিযোগ করেছিল যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কতিপয় সেনা অফিসারের সংগে ষড়যন্ত্র করে শেখ মুজিব ভারতের সহযোগিতায় সশস্ত্র উপায়ে পূর্ব পকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। এজন্য ১৯৬২ সালে তিনি গোপনে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা যান। সেখানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সংগে দেখা করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের ভূমিকা ছিল বেশি।

এখন প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ থেকে বলা যায় যে, মামলাটির ভিত্তি ছিল। তবে পাকিস্তান সরকার যেভাবে মামলাটি সাজিয়েছিল আসলে ঘটনাটি তেমন ছিল না। তবে, অভিযুক্তরা দেশকে মুক্ত করার জন্য একটা পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত তৎকালীন ক্যাপ্টেন শওকত আলীর স্মৃতিকাহিনী পড়ে এই ধারণা হয় যে, তিনটি বিষয়কে একত্রিত করে এই মামলাটি সাজানো হয়েছিল।

(১) ১৯৬২-৬৩ থেকে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রধানত নিম্ন পর্যায়ের কিছু নৌসদস্যদের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনা করছিলেন,

(২) ক্যাপ্টেন শওকতরা একই উদ্দেশ্যে আলাপ করছিলেন মূলধারার কিছু বাঙালি অফিসারের সাথে,

(৩) সিভিল সার্ভিসের রুহুল কুদ্দুস, আহমেদ ফজলুর রহমান ও খান শামসুর রহমান এবং আরও কয়েকজন সদস্য নিজেদের মধ্যে এনিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সাথেও হয়তো তাঁদের আলাপ হয়েছিল। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কোনো পরিকল্পনা তাঁরা নিতে পারেননি।

শওকত আলীর মন্তব্য যে, মোয়াজ্জেম হোসেন তাড়াহুড়া করেছেন এবং তাঁর গ্রুপ গোপনীয়তা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন না। ফলে সেনা সদস্যরা ধরা পড়েন। বঙ্গবন্ধু এই প্রয়াসের সঙ্গে হয়তো সরাসরি যুক্ত ছিলেন না, তবে হয়তো তাঁর প্রশ্রয় ছিল। তবে তিনি যে বাংলাদেশের মুক্তির প্রচেষ্টায় আগরতলা গিয়েছিলেন তা সত্য। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ভেবেছেন তাও সত্য। পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা দফতর তা জানতো। তাই অংকুরেই সে চেষ্টা বিনাশ করার লক্ষ্যে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মামলাটি সাজানো হয়েছিল।

মামলার প্রতিক্রিয়া

কিন্তু তার ফল হয়েছিল উল্টো। বাঙালির মনে এই ধারণা হয়েছিল যে, শেখ মুজিব যেহেতু বাঙালির মুক্তিসনদ ছয়দফা আদায় করার জন্য লড়ছেন সে কারণেই তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।

বিচারকার্য

আগরতলা মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন বেলা এগারটায় কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের একটি বিশেষ কক্ষে মামলার শুনানি শুরু হয়। মামলাটি ছিল পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২ ক এবং ১৩১ ধারা অনুসারে। মামলায় সাক্ষীর সংখ্যা ছিল ১১ জন, রাজসাক্ষীসহ মোট ২২৭ জন। প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের নিয়ে একটি আত্মপক্ষ সমর্থকদল গঠন করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা ব্রিটেনের প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়াম এমপিকে বিশেষ ট্রাইবুনালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান প্রমুখ। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রধান কৌসুলী ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদের ও অ্যাডভোকেট জেনারেল টি.এইচ.খান। ট্রাইবুনালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এস.এ.রহমান। অপর দুই বিচারপতি ছিলেন এম.আর.খান ও মকসুমুল হাকিম। ২৯ জুলাই ১৯৬৮ মামলার শুনানি শুরু হয়। এ সময় স্যার টমাস উইলিয়াম ট্রাইবুনালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ৫ জুলাই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বিশেষ ট্রাইবুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেন।

মামলা প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন

ইতোমধ্যে মামলার শুনানির কার্যবিবরণী পত্রিকাগুলো ফলাও করে প্রচার করতে থাকে। পত্রিকায় অভিযুক্তদের প্রতি নানান অত্যাচারের বিবরণী প্রকাশ হতে থাকলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সাল থেকে জেলে ছিলেন। তাঁর মুক্তির দাবিতে আন্দোলন জোরদার হতে থাকলে পাকিস্তান সরকারও আন্দোলন দমনে গুলির পথ বেছে নেয়। ইতোমধ্যে ছাত্রসহ কয়েকজন নিহত হন। পুলিশের নিপীড়নে আহত হন অনেকেই। ১৯৬৯ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ও সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হককে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়। হাসপাতালে জহুরুল হক মারা গেলে ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকাবাসী রাস্তায় নেমে আসে। আইয়ুব খান পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন ও প্যারোলে শেখ মুজিবকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। শেখ মুজিব তা প্রত্যাখান করেন। কিন্তু ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে ও বিনাশর্তে ৩৫ জন অভিযুক্তকেই মুক্তি দেয়।

সার্জেন্ট জহুরুল হক

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আগরতলা মামলার গুরুত্ব বিষয়ে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

- ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি সরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার এক ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে ও একটি মামলা দায়ের করে। এই মামলার ১নং আসামী করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। মোট আসামীর সংখ্যা ছিল ৩৫।
- ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের একটি বিশেষ কক্ষে মামলার শুনানি শুরু হয়। বাঙালিরা এটিকে মিথ্যা মামলা হিসেবে অভিহিত করে এবং মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন জোরদার হলে সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয় এবং বিনাশর্তে ৩৫ জন অভিযুক্তকে মুক্তি দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সরকারি নথিতে আগরতলা মামলার নাম কী ছিল? (জ্ঞানমূলক)
ক) আগরতলা মামলা
খ) করাচি ষড়যন্ত্র মামলা
গ) ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা
ঘ) রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য

২। আগরতলা মামলা কেন করা হয়? (অনুধাবন)
i) ছয় দফা দাবীকে নস্যাৎ করতে
ii) নিপীড়নের মাধ্যমে মানুষকে দমিয়ে রাখতে
iii) পাকিস্তানের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের শাস্তি প্রদান করতে।

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৩। আগরতলা মামলার পেছনে আইয়ুব সরকারের উদ্দেশ্য ছিল– (উচ্চতর)
i) শেখ মুজিবকে ধ্বংস করা
ii) আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করা
iii) বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৩.৬ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৬৯ –এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি বলতে পারবেন;
- ছাত্রদের এগার দফা দাবি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	শেখ মুজিবুর রহমান, ডাকসু, এগারদফা কর্মসূচি, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, স্বায়ত্তশাসন, শহীদ আসাদুজ্জামান, শহীদ ড. শামসুজ্জোহা, বঙ্গবন্ধু উপাধি, জয়বাংলা শ্লোগান, গোলটেবিল বৈঠক, ইয়াহিয়া খান।

ভূমিকা

১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর একমাত্র আন্দোলন যা সারা বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সেকারণেই ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানরূপে অভিহিত হয়েছে।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি

(১) ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় থেকেই পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উচ্চারিত হচ্ছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে, ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়নের সময়, অর্থাৎ সময় ও সুযোগ পেলেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি পেশ করা হয়। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর এই দাবি আরো জোরাদার হয়। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থা যে কতটা দুর্বল তা স্পষ্ট হয়ে যায়। মাত্র ১৭ দিনের যুদ্ধেই পূর্ব পাকিস্তান প্রশাসনিক দিক দিয়েও কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের পর আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করে।

(২) পূর্ববাংলা/পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক কর্মীরাও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির উপর প্রচন্ড ক্ষুব্ধ ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই বাংলাভাষাকে ইসলামীকরণ করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে আরবি কিংবা রোমান অক্ষরে পরিবর্তিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলায় ভাষা পুর্নগঠন কমিটি গঠন করা হয়। পূর্ব বাংলায় তা কড়া প্রতিবাদ হওয়ায় ঐ কমিটির রিপোর্ট ১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৫৯ সালে রোমান হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগ নেয়। তবে তীব্র প্রতিবাদের মুখে আইয়ুব খানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তান রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ থাকে। ১৯৬৭ সালে আগস্ট মাসে (১৩৭৪ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণের পূর্বে) বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়। আইয়ুব-মোনেম চক্র কেবল রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা বাংলা ভাষা সংস্কার করে একটি 'জাতীয় ভাষা' প্রচারের উদ্যোগ নেয়। বাংলা ভাষা পাকিস্তান সংস্কৃতি বিরোধী পাকিস্তান সরকারের এসব অপচেষ্টার কারণে পূর্বপাকিস্তানে বুদ্ধিজীবী মহল ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়।

(৩) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এগিয়ে নেয়। শেখ মুজিবকে ঐ মামলায় আসামী করা হয় ১৮ জানুয়ারি (১৯৬৮)। ১৯ জানুয়ারি জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আসে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যে আলোচনা শুরু করেন ছয়দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে। ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে মওলানা ভাসানী বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে 'ঘেরাও কর্মসূচি' নামে নতুন এক আন্দোলনের ডাক দেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ডাকসু ও চারটি ছাত্র সংগঠনের সাত জন নেতা প্রণিত ১১ দফা কর্মসূচি। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্র নেতৃবৃন্দ ১১ দফা ঘোষণা করেন। মূলত ৬ দফার বিস্তারিত রূপই ১১ দফা। কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার অর্জনই ছিল ১১ দফা দাবির মূল বক্তব্য। এগার দফার আন্দোলনই উনসত্তরের গণ আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। ১১ দফার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফাও অন্তর্ভুক্ত করে আরো ৫টি দাবি সন্নিবেশিত করা হয়।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাবলি

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা দাবির মধ্যে আওয়ামী লীগের ছয়দফা অন্তর্ভুক্ত হয়। এগারো দফায় বাঙালি মধ্যবিত্ত ও কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এগারো দফার আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সমর্থন লাভ করে এবং আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব ছাত্র-নেতৃবৃন্দের হাতে চলে আসে।

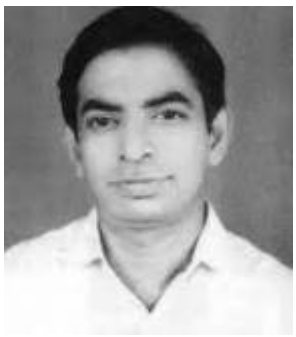
শহীদ ড. শামসুজ্জোহা

শহীদ আসাদ

আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হলেও তা ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে তুঙ্গে ওঠে এবং মধ্য জানুয়ারিতে গণআন্দোলনের রূপ নেয়। আইয়ুববিরোধী মিছিল মিটিং সভা সমাবেশ নিত্যদিনকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আন্দোলন কেবলমাত্র ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা পল্লীগ্রামসহ সকল মফস্বল শহরেও বিস্তৃত হয়েছিল। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ দেশের সকল মৌলিক গণতন্ত্রীকে পদত্যাগের আহ্বান জানালে অনেকেই সে আহ্বানে সাড়া দেন। কয়েকজন বিরোধী দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য পদত্যাগ করেন। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনের সংগে একাত্মতা ঘোষণা করেন। আইয়ুব পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনী দিয়ে ঐ আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আন্দোলনতো স্তব্ধ হয়নি বরং শ্রমিক শ্রেণির অংশগ্রহণে তা দিন দিন আরও শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে যখন প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করার সময় ১৮ ফেব্রুয়ারিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা পুলিশের গুলি ও বেয়নেট চার্জের ফলে মৃত্যুবরণ করেন। ড. জোহার মৃত্যুসংবাদে সারাদেশে এমন ব্যাপক গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হয় যে, সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়। মুক্তি দেয়া হয় রাজবন্দীদেরও।

শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি লাভে ঢাকায় আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। পাঁচ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে উক্ত সমাবেশে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদের প্রস্তাবনায় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। উক্ত সভাতেই 'জয় বাংলা' স্লোগানের উদ্ভব ঘটে। সভায় 'বঙ্গবন্ধু' ছয়দফা ও এগার দফা দাবি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়ার পর আন্দোলনের ব্যাপকতা আরো বেড়ে যায়। এমনি পরিস্থিতিতে আইয়ুব খান সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি মেনে নেন, ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন, এমনকি আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে না দাঁড়ানোরও প্রতিশ্রুতি দেন। একই সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে বসার আহ্বান জানান। রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত (১০.০৩.১৯৬৯) উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু যোগদান করেন। মওলানা ভাসানী ও জুলফিকার আলী ভুট্টো উক্ত গোলটেবিল বৈঠক বয়কট করেন। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ও ১১ দফা দাবি আলোচনার জন্য উপস্থাপন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৈঠক ব্যর্থ হয়।

১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। সম্পূর্ণ সিভিল সমাজ অস্থির, উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন আর কেবল পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা পশ্চিম পাকিস্তানেও ব্যাপকতা লাভ করে। এমতাবস্থায় আইয়ুবের পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ২৪ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানে আবার জারি করা হয় সামরিক আইন।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে প্রায় ১০০ জন পূর্ব পাকিস্তানি নিহত হয়েছিলেন, তার মধ্যে ৩৪ জন শিল্প-কারখানার শ্রমিক, ২০ জন ছাত্র, ৭ জন সরকারি কর্মচারী, ৫ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ১ জন স্কুল শিক্ষক অন্যতম।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	• 'গণঅভ্যুত্থান' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখুন। • এগারদফা ও ৬ দফার মধ্যে কোন কোন দফার মিল আছে তা শিক্ষার্থীগণ মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

১৯৬৯ -এর আন্দোলন বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সেজন্য এ আন্দোলন গণআন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান নামে অভিহিত হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ক্রমাগতভাবে পূর্ব বাংলা/পূর্বপাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে তার বহি:প্রকাশ ঘটে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে। এসময় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ঘোষিত ১১ দফা দাবির মধ্যে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৬৬ সালে ঘোষিত ছয়দফা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে প্রায় ১০০ জন পূর্বপাকিস্তানী নিহত হয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা তাদের মধ্যে অন্যতম। এ আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। আগরতলা মামলা বাতিল হয়। শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তি পেয়ে রেসকোর্সের গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৬৯ সালে ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে কে নিহত হন?
ক) ড: শামসুজ্জোহা খ) জহুরুল হক গ) আসাদুজ্জামান ঘ) মতিউর রহমান

২। ডঃ শামসুজ্জোহা ছিলেন–
ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র খ) ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবী
গ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ঘ) রাজশাহী সরকারি কলেজের শিক্ষক

৩। ইলিয়ট গঞ্জ কলেজের ছাত্ররা 'ক' নামক দাবীর মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থানের ডাক দেয়। 'ক' এর সাথে সাদৃশ্য দেখা যায় কোনটির?
ক) ৬ দফা খ) ১১ দফা গ) ২১ দফা ঘ) ৮ দফা

৪। ১৯৬৯ সালে কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন। এখানে তাকে কী উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
ক) জাতির জনক হিসেবে খ) বাঙালির পিতা হিসেবে গ) বঙ্গবন্ধু হিসেবে ঘ) বীরশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে

৫। ১৯৬৯ সালের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল–
i. অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।
ii. বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে।
iii. ব্যাংক বীমা ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.১ ঃ ১. ঘ ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. ক ৭. গ ৮. ঘ ৯. খ ১০. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.২ ঃ ১.গ ২. গ ৩. গ ৪. গ ৫. খ ৬. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৩ ঃ ১. গ ২. ক ৩. গ ৪. ঘ ৫. গ ৬. ঘ ৭. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৪ ঃ ১. গ ২. ঘ ৩. খ ৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৫ ঃ ১. ঘ ২. ক ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৬ ঃ ১. গ ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. ঘ